# কাজললতা

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
আর, এ, নিজামী
ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
৬, এ্যাণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
সন্তোষ কুমার ধর
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম দু'টাকা আট আনা

সত্যেন কয়েক দিন পরে সেদিন একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলাম ?
একটু দুর্বল হলেও চেহারা তার ফিরে গিয়েছিল। রোগশয্যা যেন তার তীর্থক্ষেত্র, যখন উঠে এল তখন তার উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে।

বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও সুলতা তাকে ধরে ধরে বাইরে আনে। একান্ত স্নেহে তাকে সদা-সর্বদা সাবধানে রাখে। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এখনও তার কাছারিতে বেরোবার হুকুম নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে এখনও তাকে স্নানাহার করতে হয়।

ক'দিন পরে সুলতার মুখের দিকে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে সত্যেন থমকে দাঁড়াল। একটি মনোরম মালিন্যের ছায়া যেন তাকে ঘিরেছে! চোখ দুটি একটু অলস, দৃষ্টি যেন শ্রান্ত; কৃশ তনু —অপর্ণার মত তপঃক্লিষ্টা!

—দেখছ যে? কি?

সত্যেন একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—অনেক দিন ধরে তোমাকে কেবল একটি কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি সুলতা! আমি তোমাকে ভালবাসি। বল, সত্যি নয়?

সুলতা তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সমস্তটাই জানিয়ে দিল।

সেদিন সন্ধ্যার আকাশে কেন যে কুয়াশা ছিল না কে জানে! একটা বড় সুপুরি গাছের পাশ দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে বারান্দার একটা ধারে পড়েছিল। সমস্ত আকাশটায় তারা ছড়িয়ে রয়েছে!

সত্যেন এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিল, এবার বলল—দেখেছ সুলতা, দিনের বেলা এত আলো, এত গোলমাল কিন্তু রাতের বেলা চাঁদ ওঠে! রাতে মনে হয় দিনটা মিথ্যে, আর দিনের আলোয় রাতের কথা ভাবলে হাসি পায়—আশ্চর্য নয়?

সুলতা বলল—তাইত, আমিও ভাবি!

একটু থেমে সত্যেন বলল—আজ দিনের বেলা একটা কথা ভেবে হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সন্ধ্যে হতেই সেটা যেন নেশার মত মনটাকে পেয়ে বসেছে! মানুষের মন ভারি আশ্চর্য জিনিস সুলতা!

-কি বল ত? আচ্ছা বলই না কি? আজকাল ত তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি। পারিনে?

—তোমাকে শোনাবার মত যদি না হয়?

—আমাকে শোনাবার মত নয়? চোর-ডাকাতের কথা বুঝি?—বড় বড় চোখে সুলতা তাকাল।

সত্যেন হাসতে লাগল। সুলতা তার হাতটি ধরে বলল—তা হোক, বল। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাদের কোনো দুঃখের কথা বলবে। তা ছাড়া তোমার কথা কি আর আমার কাছে চেপে রাখতে পারবে?

সত্যেন বলল—ঘুমের ঘোরে আজ বহুকালের একটা পাগলামীর কথা ভাবছিলাম। স্বপ্ন ঠিক নয়, খেই যেখানেই হারায়, আমার মন অমনি সেটাকে ভরাট ক'রে দেয়। অনেক দিন আগে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বহুদিন ধরে দুজনে মিলে নানা জল্পনা করেছি, কোনো দূর দেশে গিয়ে বিয়ে করব, তাও ঠিক করেছিলাম··· কিন্তু রাস্তার ধারে একদিন দাঁড়িয়ে দেখলাম তাদেরই বাড়ীতে আগে শানাই বেজে উঠল, মেয়েটা হাসতে হাসতে গেল শ্বশুরবাড়ী। তা যাক্, এমন ত সংসারে নিত্যই ঘটছে! আমিও হাসতে হাসতে জীবন-সংগ্রামে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আজ দুপুর বেলা স্বপ্নে দেখি—

সুলতা তার মুখের দিকে তাকাল।

—দেখলাম হায়রে, তার চোখের মধ্যে এত বর্ষা কোথায় জমা ছিল? সে যে একেবারে প্লাবন! প্রথম ভালবাসাই বোধ হয় জীবনের সব চেয়ে বড় স্মৃতি! ঘুমের ঘোরে আমিও যে ফুঁপিয়ে উঠছিলাম তা ত আর অস্বীকার করতে পারিনে! মেয়েটাকে দরিদ্র বলে মনে হল না, শোকাতুর বলেও মনে হল না, মনে হল তার পাঁজরের মধ্যে একটা তীর বিঁধে রয়েছে, দর দর ক'রে রক্ত গড়াচ্ছে মুক্তি পাবার জন্যে সে যেন ছটফট করছে! কিন্তু আশ্চর্য্যি, আমি জানতাম না যে আমি এত দুর্বল! আমি এমন হিসেবী লো

হয়েও সেই অসম্ভবের জন্য যে কাঁদতে পারি, একথা কি জানতাম? সুলতা, ঘুমের মধ্যে আমরা আমাদের আসল মানুষটির খোঁজ পাই।

সুলতা সাড়া দিল না।

সত্যেন বলল—কিন্তু সেই মেয়েটার দিক থেকে কি কোনো হদিস পাওয়া যেতে পারে? আচ্ছা সুলতা, তোমার প্রথম স্বামীর সম্বন্ধে কি মনে হয় বলবে? ও কি, কাঁদচ কেন? যাক্, আমার পুরানো প্রেমের কাহিনী এবার সত্যিই সার্থক হল!

তারপর ঝোঁকের মাথায় আবার সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল—আমার কথার উত্তর দেবে না, সুলতা?

সুলতা বলল,—তাঁর কথা আমি বলতে পারিনে!

—বেশ ত, তোমার কথাই বল। না না, এতে লজ্জার ত কিছু নেই! তা ছাড়া আমার মতন ত আর নয়, তুমি যে তার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলে!

সজল মৃদুকণ্ঠে সুলতা বলল—তিনি ছাড়া আর আমার কেউ ছিল না! আমাদের দুঃখুও ছিল না, অভাবও ছিল না! তাঁর মত ভালমানুষ আমি সত্যিই কোথাও দেখিনি!

—কোথাও না?

দীর্ঘ নিশ্বাসের আবেগে সুলতার গলা কেঁপে উঠছিল। বলল—না, আমি তেমন আর কোথাও দেখিনি!

—আচ্ছা, তিনি তোমায় খুব ভালবাসতেন—না?

—হুঁ, তিনি কোথাও থাকতেন না আমায় ছেড়ে।

পশ্চিমের চাঁদ, পশ্চিমেই হেলে পড়েছে। উত্তরের হাওয়ায় সুপুরিগাছের পাতাগুলির মধ্যে সর্ সর্ ক'রে শব্দ হচ্ছিল। একটা ঠিকা-গাড়ীর শব্দ নিকট থেকে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল।

সত্যেন একটু নড়ে চড়ে সাগ্রহে গলা বাড়িয়ে বলল—আর তুমি? তুমি তাঁকে ভালবাসতে না?

সুলতা কেঁদে বলল—আমি মেয়েমানুষ, তাঁর সেই ভালবাসার জন্যে আমি কতটুকু—

—তা নয়, তুমি ভালবাসতে কিনা তাই বলছি।

সুলতা বলল—তিনি ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না! কত কাঁদলাম, ঠাকুরের পায়ে কত—

সে হয়ত আত্মহারা হয়ে বলেই চলতো তার পূর্ব-স্বামীর কথা, কিন্তু হঠাৎ সত্যেন বাধা দিয়ে বলল—ও—বুঝেছি।—বলতে বলতে সে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর ব্যস্তকণ্ঠে পুনরায় বলল—সব অন্ধকার যে! নাঃ সুলতা, তুমি, আজকাল কিছুই দেখো না! মাথাটা বোধ হয় একটু—না, না, তা বলে জ্বর নয়, আমি বেশ আছি! বরং একা একা একটু বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি।

প্রায় টলতে টলতে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিছানার ওপর বসে তার মনে হল, নিজের হাত-পা-মুখ সর্বাঙ্গ যেন অতিরিক্ত কুৎসিত হয়ে উঠেছে! একটা তীব্র জঘন্য দুর্গন্ধে যেন এই সুসজ্জিত ঘরখানি ভরা। ঘরের ভেতরকার এই বিচিত্র ঐশ্বর্য, চারিদিকের এই বহুমূল্য আসবাব, সবগুলি যেন তাকে অচ্ছেদ্য পাশে আবদ্ধ করেছে; বন্দী করেছে।

॥ ২ ॥

অভিশপ্ত বন্দীর চোখে রাত্রি যেমন ক'রে কাটে।

হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতরের বিচিত্র ঐশ্বর্যের বন্ধনের মধ্যে বসে সত্যেন যেন অঞ্জলি ভরে অপরিমিত পরিমাণে আকণ্ঠ বিষপান ক'রে উঠল। সমস্ত দেহের রক্তে সে-বিষ ছড়িয়ে গিয়ে প্রতি রোমকূপ তার জ্বালা করতে লাগল।

সুলতাকে আলো হাতে ভেতরে ঢুকতে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে সোজা ছাতের দিকে চলে গেল, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সে খানিকক্ষ পায়চারি করতে লাগল। চারিদিকের এই দিগন্তজোড়া অন্ধকা কৌটার মধ্যে বায়ুরুদ্ধের মত হাঁ ক'রে একবার নিশ্বাস নেবার চে

করল, আপনার বুদ্ধিহীনতার জন্য নিয়তির বিরুদ্ধে একব। কি
ক'রে উঠতে চাইল—কিন্তু তার সে উত্তেজনার কোনো প্রকাশ
না। তার যন্ত্রণা ছিল, বেদনা ছিল, পীড়ন ছিল, কিন্তু মুক্তি
ছিল না।

রাত্রি গেল সকালের দিকে গড়িয়ে—পূর্বাকাশের সীমায় লাল-নীল ফুটে উঠে সূর্যোদয়ের আভাস জানিয়ে দিল।

রোদ উঠল ; সকাল গড়ালো দুপুরের দিকে। সত্যেন তখনও নিশ্চল-নিঃশব্দ একখণ্ড পাথরের মত দাঁড়িয়ে। সুলতা নির্বাক বিস্ময়ে গত রাত্রি থেকে স্বামীকে লক্ষ্য করছিল ; এবার আর থাকতে পারল না, পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে বলল—আজ তাড়াতাড়ি কোথা যাবার কথা ছিল যে ?

ঘাড়টা একটুখানি কাত ক'রে হাসির একটি চেষ্টা মুখের মধ্যে এনে সত্যেন বলল—তাড়াতাড়ি আর নয়, এবার একটু আস্তে আস্তে—ঝেলে ?

আধখানা চেহারা যেন তার আগুনে পুড়ে গেছে। কেম তা লতা কিছুই বুঝল না, অপরিসীম মমতায় তার চোখ দুটি হঠাৎ কবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ও-ঘর থেকে একটি রকাবিতে কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন সাজিয়ে এনে পরম যত্নে সে ত্যেনের কাছে ধরল। বলল—রাতে কাল কিছুই খাওনি—হাত াবার জল দেবো ?

রেকাবি রেখে সে জল আনল।

সত্যেন বলল—তুমি খুব সরল, না সুলতা ? ওটা বোকামি আর কামি দুই। মানুষের সরলতা যে কত বড় বিপদ আনে তা তুমিই খালে। থাক্—ব'লে সে আপাদমস্তক সুলতার প্রতি একবার কিয়ে পুনরায় বলল—খেতে রুচি আর নেই,—পেটুক হলেও বা া ছিল। শুধু খোসা আমি খাইনে, আমি চাই শাঁস!

ইত্যাদি বাজে কথা বকতে বকতে সে বেরিয়ে চলে গেল।

আবহাওয়াটা কেমন ক'রে যেন হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠল। খেতে

—তা নয়, কি

সুলতা...রিটা আলুনি লাগে, শুতে গিয়ে বিছানার মধ্যে পিঠে ...র ফোটে, চলতে গেলে পা ব্যথা করে, কথা বলতে গেলে ভিতর থেকে আনন্দ যোগায় না। ঘরবাড়ী, গাছপালা, চারিদিকের এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুগুলি যেমন বিবর্ণ বিস্বাদ, তেমনি অবসন্ন ও আনন্দহীন।

ঘড়ির কাঁটা ধরে আগে কাজ চলত, আজকাল সময়ের অনুবর্তন করতে গেলে একটু শ্রান্তি আসে। কাছারি যেতে সত্যেনের আজকাল বিলম্ব হয়ে যায়। স্নান এবং আহার, দুটো এক সাথে প্রায়ই হয়ে ওঠে না। কাছারি থেকে ঘরে ফিরতেও কি জানি কেন দেরি হয়। কোনোদিন সে গঙ্গার ধারে ঘুরতে যায়, কোনোদিন বাগানে, কখনো কোনো মাঠে—কখনও বা কোথাও চুপ ক'রেই হয়ত বসে থাকে।

আগে সত্যেন বাড়ীতে ঢুকলেই একটা সোরগোল উঠত, আজকাল সে একেবারে নিঃশব্দে আসে। পা টিপে টিপে এসে জুতো খুলে রেখে অন্য ঘরে গিয়ে ঢোকে। রাত্রির অন্ধকার দুইটি নরনারী চোখে একটি উদাস বিষণ্ণতা আনে। সুলতা এই নিরানন্দের কোনে কৈফিয়ত চায় না, কোনো অর্থ আবিষ্কার করবার জন্য তার মন চঞ্চ হয় না—শুধু কেবল স্বামীর মনের বিষণ্ণতাটুকু স্মরণ ক'রে তার বু বেদনায় ভরে ওঠে। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে স্বামীর পায়ের কা গিয়ে বসে।

—ও কি হচ্ছে?—সত্যেন বলে—মিছামিছি পায়ে হাত বুলো কেন? সুস্থ মানুষের সেবা করতে গেলে লোকে যে সন্দেহ করে

পায়ের ওপরেই হাত'দুটি থেমে স্থির হয়ে থাকে। মৃদু আলো সত্যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলে—ঠিক সাপের তোমার হাতখানা আমার পায়ের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, চুড়িগু ঝক্‌ঝক্ করছে, তোমারও তাই মনে হচ্ছে না সুলতা?

সুলতা ঘাড় নেড়ে জানাল তারও তাই মনে হচ্ছে।

সত্যেন উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যায় বটে কিন্তু আ

তখনই ঘুরে এসে হেসে বলে—এগুলো তোমার অভ্যাস, কি ? এই পিয়ে ধর তোমার এই সেবা-যত্নগুলো ! স্বামীকে নিয়ে ঘর করা আগে তোমার অভ্যাস ছিল, এগুলো তোমার সমস্তই মুখস্থ—নয় ?

সুলতা নিঃশব্দে সরল দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার চুপ ক'রেই বসে রইল।

সত্যেন স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াল। তারপর উত্তেজনায় উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ পুনরায় হেসে বলল--তোমার মধ্যে না আছে রক্ত, না আছে আগুন, থাকলে এত বড় অপমান নিশ্চয়ই তোমার গায়ে বাজত ! এক রকমের জীব আছে তাদের গায়ে তীর বেঁধে না, ঠিকরে পড়ে !

সুলতা সজল চোখে শুধু বলল—তোমার শরীর ভাল নেই তাই এসব কথা বলচ।

শরীর ভাল নেই ? বেশ আছি, চমৎকার আছি—এর চেয়ে সত্যি কথা, সহজ কথা আমি আর কোনোদিন বলিনি !

সুলতা বলল—আমি কিছুই মনে করি না !

তা জানি, তাই জন্যেই ত তোমায় এত ভারি মনে হচ্ছে ! সুলতা আমি ভেবেছিলাম হাল্কা পাখায় তুমি আমার মনের আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াবে ; এখন দেখছি তুমি পাথরের মত আমার স্রোতের মুখ চেপে বসেছ ?

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সত্যেন চলে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে যারা বেঁচে থাকে, সত্যেন সেই দলের মানুষ। এক মুহূর্তের একটি কথার আগে তার জীবনে সুখ ছিল, তৃপ্তি ছিল, সুন্দরী মমতাময়ী পত্নী ছিল, আনন্দ ও শান্তি ছিল—কিন্তু পরমুহূর্তে দেখা গেল তার কিছুই নেই ! আতসবাজীর মত সব ছাই হয়ে গেছে। বেঁচে আছে বটে কিন্তু সে থাকা যেমন নিরবলম্ব তেমনি নিষ্ক্রিয়।

সুলতার সমস্ত কথা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। অবারিত অশ্রু ছাড়া এখন তার আর কোনো সম্বল নেই। চোখের জল ছাড়া ভালবাসার কি আর কোনো পরিচয় আছে ?

—জ্ঞানের অভাবে তার সারাদিন যে কেমন ক'রে কাটে তা শুধু সেই জানে। শ্রীহীন ঘরগুলিকে সে আবার নতুন উদ্যমে ও উৎসাহে সাজাতে থাকে। ছবিগুলির ধুলো ঝাড়ে, বই-কাগজগুলির বিন্যাস করে, বাক্স-আলমারিগুলি ঝাড়ন দিয়ে মুছে মুছে তাদের চেহারা বদলায়, বিছানাগুলি রোদে দিয়ে আসে।

—বাঃ, এত' বেশ! দমে যাবার মেয়ে তুমি নও দেখছি! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—কি বল?

ঘোমটাটি মাথায় তুলে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে সুলতা বলে—এগুলো অনেক দিন দেখা হয়নি তাই জন্যে—

হ্যাঁ গো, বুঝতে পেরেছি; তোমাকে বুঝতে পারব না, আমি কি এতই বোকা? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুবিধে হবে কি?

সুলতা কোনোদিন প্রশ্ন করে না। আজ বলল—কি সুবিধে?

সত্যেন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠতে বেলা হয়ে যায়। কোমরে ব্যথা, মাথা টন্‌টন্ করে,—চোখের ঘুম ছাড়ে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলার বাইরে সত্যেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। শীতের সকাল রোদের আলোয় সমস্ত ঘর ভরে গেছে, উঠে সারাদিনের কাজে নামবার কোনো ইচ্ছা তার দেখা যায় না; খবরের কাগজটা একবার পড়বার চেষ্টা করে কিন্তু ভাল লাগে না। গরম চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

তবু এক সময় উঠতে হয়। চারিদিকের আলোয়, লোকজনে কোলাহলের মধ্যে, ঠাণ্ডা বাতাসের যাতায়াতে যেন একটি ক্রুদ্ধ বিরক্তি ভেসে ভেসে বেড়ায়। দিনের মন্থরতার মধ্যে কেবলই একই সুর বেজে বেজে ওঠে—শ্রান্ত, অতৃপ্ত, অবসন্ন একটি সুর!

উঠে বাইরে এসে দেখল, সুলতা বসে বসে কাঁদছে। ঈষৎ কণ্ঠে সত্যেন বলল—তোমার আবার কি হল?

সুলতা কোনো উত্তর দিতে পারল না। সত্যেন বলল—কেঁদে বেড়াচ্ছ, এর মানে ত বুঝতে পাচ্ছি না? তা ছাড়া তে

জল আনবার মতন আমি ত কিছুই করিনি? নাও ওঠো।
াও গিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কর।

সুলতা উঠে দাঁড়াল। চোখ মুছে বলল—তোমার নিশ্চয় শরীর
ারাপ হয়েছে, আমাকে লুকিয়ে রয়েছ।

সত্যেন একটু হেসে বলল—সতী-সাবিত্রী স্ত্রী, সবই বুঝতে পারো
ইকি! তা ধর মানুষের শরীর, রোগ-ভোগ কি দু'একবার হতে
ই? তবে কি জানো?—ব'লে দু' পা এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে
লে যাবার সময় আবার সে বলল—এ রোগ নীলরতন সরকারেরও
াগালের বাইরে মনে রেখো।

সুলতা মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কয়দিন কাছারি যাবার উৎসাহ তার আর ছিল না। কাজকর্ম
মস্তই বন্ধ রয়েছে। সুলতার চিন্তার আর সীমা নেই। নীচের
-চাকর পর্যন্ত সবাই যেন তটস্থ সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে।

সুলতা আবার এল। সত্যেন তখন ছাতের রোদে মাথা হেঁট
'রে বসে রয়েছে। বলল—দরজায় কড়া নেড়ে কে ডাকছে
তামাকে!

মুখ তুলে সত্যেন বলল—আমাকে? ওঃ, বুঝতে পেরেছি, উপেন
সেছে। বলে পাঠাও যে আমি বাড়ী নেই! ওর কাজকর্ম আমি
ছুই ক'রে উঠতে পারিনি। আরে যাও বাপু, হাঁ ক'রে চেয়ে থেকো
! এটুকু মিথ্যে কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না!

সুলতা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

—দাঁড়িয়ে রইলে যে? থাক্, তবে আমিই চাকরকে দিয়ে বলে
ঠাই।

সুলতা মৃদুকণ্ঠে বলল—উনি যে তোমার বন্ধু তুমি বলতে?—
'লে সে পা বাড়াল।

সত্যেন হাসল। হেসে বলল—কি আশ্চর্য, বন্ধুর সঙ্গে একটুখানি
থ্যাচারও করতে পারো না?—ব'লে সে আস্তে আস্তে উঠে চলে
ল।

চাকরের কাছে খবর পেয়ে বাবুটি চলেই যাচ্ছিল; অদূরে স্নুলতাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। সত্যেনের স্ত্রী সুন্দরী এ কথা সে জানত, কিন্তু সৌন্দর্য যে এতখানি তা তার জানা ছিল না! ভেতরে দু'পা এগিয়ে এসে বলল—দেখুন!—ব'লে সে দাঁড়াল।

স্নুলতা মুখ তুলতেই সে একটু সলজ্জ হেসে বলল—সত্যেনের সঙ্গে আমার বিশেষ কাজ ছিল। আমি তার মক্কেল, বন্ধু দুইই। কাল যদি সে কাছারি না যায় ত আমিই আর-একদিন আসবো—আজ এখন চললাম! দেখবেন, তাকে আমার খবরটি দিতে ভুলবে না যেন!

ব'লে একটু হেসে উপেন মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। বাইরে এ একবার থমকে দাঁড়াল, আবার একটুখানি হাসল, বাঁ-হাতের দা পাঞ্জাবীর আস্তিনটা সরিয়ে একবার হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নি গায়ের শালটা একবার ঠিক করল, তারপর নিজের মনেই বলল অল্ রাইট!

ব'লে হাতীর দাঁতের ছড়িটা ঘুরিয়ে নারীজনোচিত ভঙ্গী ব শিস্ দিতে দিতে রাস্তার ধার ঘেঁষে সে চলতে লাগল।

শীতের বেলা শেষ হয়ে আসে। সত্যেনের তৃপ্তিহীন মন সময় অশান্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উঠে গায়ে একখানি কা জড়িয়ে সে বেরিয়ে যায়। উদ্দেশ্যহীন হ বহুক্ষণ ধরে রা অকারণে কত জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

সন্ধ্যার পর রাত্রি ঘনিয়ে ওঠে। অবিচ্ছিন্ন নিরানন্দের মধে আবার ফিরে আসে। ঘরের জানালায় একবার মুখ বাড়িয়ে ে স্নুলতা বসে বসে তারই পায়ের মোজা সেলাই করছে। মুখ ফি সত্যেন আবার চলে যায়।

কাজ শেষ ক'রে স্নুলতা খানিকক্ষণ বাদে উঠে দাঁড়ায়। ে জান্‌লা দিয়ে হু হু ক'রে শীতের হাওয়া আসছে। বোধ হয় ত্রয়ে তিথি। আকাশে অনেক উঁচুতে চাঁদ উঠেছে। সুমুখের মাঠে কে

গাছ, দূরের বাড়ীগুলি, তাঁতিদের শিবমন্দির—সমস্ত চাঁদের শুক্তি তার ভুরে গেছে। অস্পষ্ট কুয়াশায় বহুদূরে সুলতা তাকিয়ে থাকে। চোখের-তার জল ভরে ওঠে। তার এই অসহায় জীবনের অর্থ কি—একথা কি তাকে কেউ বলবে না।

তার সমস্ত দেহ, মন, চিন্তা, হৃদয় একান্ত ভালবাসা দিয়ে তৈরী। আপনার প্রকৃতিতে বন-গোলাপের মত করুণ মধুর গন্ধই সে বিতরণ করতে পারে। তার মধ্যে মাধুর্য্য আছে কিন্তু দুরাশা নেই, গ্লানিহীন পরার্থপরতা আছে কিন্তু ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা নেই। আপনার রসভারে, সৌন্দর্যে, কারুণ্যে, দানের স্পৃহায়, গন্ধের বিস্তৃতিতে নিরুদ্দিষ্টের প্রতি তাকিয়ে সে টল্‌মল্ করে। তার ভালবাসায় আঘাত নেই, দাবি নেই, ঈর্ষা নেই—সে যেমন অপরূপ, তেমনি সহজ। সে-প্রেম শর-বিদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্ করতে পারে, আকণ্ঠ বেদনায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে জানে, অপমানের ঘায়ে আত্মগোপন করে কিন্তু উজ্জ্বল তীব্রতায় আত্মপ্রকাশ ক'রে আপনার স্পর্দ্ধা প্রমাণ করে না।

অনাথিনী অপার্থিব সুলতা বহুদূরে চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিবিড় রাত্রির প্রতি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। জীবনের কোনো নিগূঢ় বেদনার সহিত তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—তার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টির প্রতি তাকালে শুধু এই কথাই বার বার মনে হয়।

রাত্রি অনেক হয়ে গিয়েছিল। সুলতা ধীরে ধীরে এসে একবার ঘরের চারিদিকে দেখল। আজকাল দিনরাত প্রায় তার নিঃসঙ্গই কেটে যায়। ঘর পার হয়ে সে বাইরে এল। পাশের ঘরের দরজার কাছে এসে দেখল, খাটের একান্তে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ত্যেন বোধ করি ঘুমিয়ে রয়েছে। তারই একধারে এসে সুলতা র পায়ের কাছে বসল। তারপর মাথাটি আস্তে আস্তে নামিয়ে ত্যেনের দুই পায়ের মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ঘরের মধ্যে সবুজ রঙের মৃদু আলো; বড় ঘড়ির কাঁটাটি টিক্ টিক্ রছে;—মাথার সমস্ত চুলগুলি সত্যেনের পায়ের উপর ছড়িয়ে ড়েছে, হেঁট হতে গিয়ে গায়ের কাঁপড় খুলে গেছে।

-াবেগে সুলতার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করছে। অদূরে
দত্যেন আস্তে আস্তে পা সরিয়ে নিল। পরে বলল—কী চেষ্টাই জনের
নেকে ভালবেসে জীবন কাটাবার জন্য মেয়েদের কি নিদারুনি ত
! সুলতা, তুমি যে তোমার আগেকার স্বামীকেই ভালবাসেন!—
ন্য দোষ দেবো কাকে? তিনি যে বেঁচে রইলেন না, সে
ত! ত্যনে
সুলতা আরো কাছে সরে গিয়ে বলল—আমি বলছিলাম যে, তুইই
ক কথা আমি ভাবছি, এ তোমার কি হল তা আমাকে বলতেই বা-
। তুমি ত এ রকম ছিলে না? ভুলবো
সত্যেন একটু হাসল। হেসে কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে
র গেল! র এ
উঠে দরজার কাছে পর্যন্ত গিয়ে সুলতা বলল—ও ঘরেই, র দা
আমাকে কিন্তু বলতেই হবে, নইলে কিছুতেই শুনবো না।— নিঃ
তে সে বেরিয়ে চলে গেল। সত্যেন তার পায়ের দি একবার ল-
গল, তারপর মুখে একটা আওয়াজ ক'রে গায়ের কাপড় তুলে
য় আবার পাশ ফিরে চোখ বুজল।

॥ ৩ ॥

কিন্তু কোনো কথাই সুলতার আর শোনা হয়নি! কারণ
ত্যনকে প্রশ্ন করা এবং তার কাছে যথাযথ উত্তর পাওয়ার দিন চলে
য়েছিল। য় দো
সমস্ত চেহারাটার দিকে তাকালে এখন বিস্ময়ের আর অংফিঁ
কে না। গায়ে-মুখে একপুরু ময়লা পড়েছে, দাড়িগোঁফ না কামি
খানা হয়ে উঠেছে কদাকার, মাথার চুল রুক্ষ,—চোখ দুটো
স্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল এবং কোটরগত, হাতের পায়ের আঙুলো
 বড় নখ,—একটি যেন ছন্নছাড়া রহস্যময় চরিত্রের মানুষ! নারীর

শক্তি তার

ল মুহূর্তের একটি সরল স্বীকারোক্তি তাকে যেন চির-
রছে।

প্রেম-বোধ করি চিরদিনই ঈর্ষাময়! স্বার্থপরতাই হচ্ছে ভালবাসার
তি!

সত্যেনের ভালবাসার মধ্যে কোথাও এতটুকু ত্যাগ ছিল না;
ম্পূর্ণ দান ক'রে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার ইচ্ছাকেই সে অন্তরে
রে লালন করেছিল। সে ছিল নিরানব্বই জনের একজন!

তার জীবন যেন একটি মাত্র অনুভূতির অপেক্ষা রেখেই চলে।
সুলতা তার আগেকার স্বামীকেও ভালবেসেছিল—এই সামান্য
স্বাভাবিক সহজ কথাটি তার জীবনের সমস্ত আনন্দ, তৃপ্তি, শান্তিকে
একটি মুহূর্তেই বিনষ্ট-বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে গেল!

চিরকাল ধরে একটি পূর্ব-স্বামীগতপ্রাণা বিধবার প্রাণহীন
দেহের ভার বয়ে বেড়াবার শক্তি তার ছিল না।

সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, এবং সে-রাত্রি যে কত তা আর সত্যেনের হুঁশ
হল না। শ্রান্তি ক্লান্তি আর নেই কারণ ওসব আর তাকে স্পর্শ করে
! ঘুরতে ঘুরতে নিশুতি রাতে সে ভূতের মত বাড়ীর দরজায় এসে
ড়াল! দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে তার ইচ্ছা হল না, সেইখানেই
স পড়ে সে দেয়ালে মাথা কাত ক'রে রইল।

অন্ধকার রাত্রি তখন চারিদিকে সাঁ সাঁ করছে!

প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙতেই সে অবাক হয়ে গেল। দেখল, কোলের
ধ্যে মাথা গুঁজে পাশে বসে সুলতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
জ্জায় ধিক্কারে তাড়াতাড়ি রাস্তার ধার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে
লতার হাত ধরে সে ভিতরে এল। বলল—ছি ছি, যেমন আমি
তমনি তুমি। রাস্তার লোকে কি মনে করবে বল দেখি? সুলতা,
তামাকে দেখে মনে হয় জীবনে তোমারও বুঝি তৃপ্তি নেই।

সত্যেনের চোখ দুটো তখন লাল হয়ে রয়েছে। গলা শুকিয়ে
ঠ হয়ে গেছে, চোখের ঘুম ছাড়েনি, দুর্বলতায় বুকের ভেতরটা ধক্
ধক্ করছে!

৲তা দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যেন বল্‌

ুলতার সর্বাঙ্গ তখন ঘুমোবো। চল ত!

াস্তে আস্তে প ফেলে সুলতা চুপ ক'রে রইল।

ালবেসে ারার মত দিনগুলি আপনার আনন্দে আগেকার

চলে না। ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের করুণ ছায়া এই

ৃহখানির ওপর নেমে এল। উপার্জনের স্পৃহা সত্যেনের

না, জনসমাজের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ ক'রে সোরগোল

চ্ছাও তার আর নেই। চিরদিনের মত আত্মলোপ করবার

সে বরণ ক'রে নিল।

প্রতিটি দিন এবার থেকে কাটবে কেমন ক'রে?

াকর তাদের সাময়িক প্রাপ্য সম্বন্ধে হতাশ হয়ে একে একে

ক'রে চলে গেল। প্রতিদিনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা এই

টির মধ্যে আর দেখা যায় না। যারা ছিল নীচে, গোপনে—

াবিই আজ মাথায় চড়ে আপনাদের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করতে

মুদী এল খাতা নিয়ে, ধোপা এল তাগাদায়, দুধওলা এসে

ড়া নাড়ল, কয়লাওলা হাঁক দিল, কাপড়ওলা চীৎকার ক'রে

ঘাদের ওপর দাঁড়িয়ে গৃহস্থরা আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের

া—সেই ভিতগুলি প্রচণ্ড দাবিতে নড়াচড়া করতে লাগল

ক ঘুলিয়ে উঠে স্বচ্ছ সরোবরকে ক্লেদাক্ত ক'রে দিল।

াবপত্র গেল, মূল্যবান পরিচ্ছদ গেল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি গেল

াচুর্য হেতু যে লোকনিন্দা এতদিন আত্মগোপন ক'রে ছিল

সুবিধা পেয়ে তারা মাথা চাড়া দিয়ে কানাকানি ক'রে বলল

ই হয়! বিধবাকে গ্রহণ করা,—এত বড় অন্যায় সইবে কেন?

ার তীক্ষ্ণ হাসি, বিদ্রূপের জঘন্য ভঙ্গী, বিরক্তির তীব্র উক্তি

মি ইঙ্গিত—একে একে ছিটকে এসে সুলতাকে রুদ্ধনিশ্বাস

ল! দয়াহীন সহানুভূতিহীন লোকনিন্দা তার হিংস্র মূর্তি

ক'রে সুলতার বুকের ওপর বসে ধারালো নখরে তার সর্বাঙ্গ

লাগল।

কিন্তু এদের বিরুদ্ধে সে কি করতে ... টুকু শক্তি তার
ক'রে নিজেকে বাঁচাবার মত মেরুদ ... নেই। চির-
বন ধরে আঘাত সইতেই সে জানে ... ক'রে সে ত
তিবাদ করতে শেখেনি।

ছুটি সজল বিশাল ও গভীর দৃষ্টি আকাশে ... শুধু
কে যেন তার ব্যর্থ জীবনের কথা বলবার চেষ্টা
জানাবে? হেমন্তের দিবাবসানের শীতার্ত ধূ
আর কিছু তার দৃষ্টিতে এল না! ওই আকাশের ... রি
সান্ত্বনা—কোথা তার ঘর, কোথা স্থান তার?

নীচে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, সুলতা মুখ ... একবার
দেখল।

—সত্যেন বুঝি বাড়ীতে নেই?

সুলতা ধীরে ধীরে নেমে এল। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল—
তিনি নেই এখন, বোধহয় এই কাছাকাছি কোথাও—

উপেন কয়েক পা ভেতরের দিকে সরে এল। বলল—নেই? ও,
আচ্ছা কোথায় গেল বলুন ত?

—আমাকে কিছুই বলে যাননি।

—বলে যায়নি? উপেন বলল—ভারি অন্যায় ত! কোথায় যাই
না যাই স্ত্রীকে অন্তত বলে যাওয়া উচিত—নয় কি, আপনিই
বলুন না?

সুলতা চুপ ক'রে রইল!

—আচ্ছা, ব'লে উপেন আরো দু' পা সরে এসে বলল—সে আজ-
কাল এত লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কেন জানেন? আমার যেন মনে হচ্ছে—
তা সে যাই হোক, তার যা ইচ্ছে সে তাই করবে, আপনি কিংবা
আমি ত আর তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে পারব না। কিন্তু তবুও
বলি, তার গতি-বিধির ওপর একটু নজর রাখলে ভাল হয়।

সুলতা মুখ তুলে তার প্রতি একবার তাকাল।

উপেন তার চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট ক'রে বলল—

ানে হচ্ছে আপনি কিছু বুঝতে পারেননি ! যাক্ গে ও-কথা, আমার কিন্তু অনেক কাজ ছিল সত্যেনের সঙ্গে !

—এলে তাঁকে বলব !

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবেন।—একটু হেসে সুগন্ধীযুক্ত সিল্কের মালখানা বার ক'রে একবার মুখখানা মুছে উপেন বলল—বেশ াপনি! স্বামীর কোনো খবর রাখেন না ; এরকম করলে কি চলে ?

মাথা হেঁট ক'রে সুলতা দাঁড়িয়ে রইল। সত্যই ত, এ যে তার য়ানক অপরাধ !

উপেন পুনরায় বলল—কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, চারিদিক এমন কিয়ে চড় চড় করছে কেন বলুন ত ?

কি একটি উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে সুলতা আবার নীরব হয়ে ল।

—এইটিই ত আপনাদের বাইরের ঘর, একটু বসি এখানে তোর পেক্ষায় ! তি

বাইরের ঘরে ঢুকে একটা চৌকির ওপর সে চেপে বসে ত্যেন হচ্ছে আমার পাঁজরের একখানা হাড় ; বন্ধু বলতে সে আ মার আর কেউ নেই ! আপনি কি আর সে-সব বুঝবেন ? বেশের দিনে আপনাদের সমস্ত কাজই আমাকে করতে হয়ে, ন আছে কি আপনার ?

ঘাড় নেড়ে সুলতা জানাল, তার মনে আছে !

উপেন বলল—আপনি ওরকম মিইয়ে থাকলে কোনো কথাই মুখে সে না ! একটু হাত-পা নেড়ে চঞ্চল হয়ে উঠুন ?

উত্তরে সুলতা [illegible] একটুখানি টেনে নিল।

এদিকে ওদিকে কোথাও জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই—নিকটে-র সামান্য একটু শব্দও শোনা যাচ্ছিল না ! দূরে কোথায় এইমাত্র সারীর ঢং ঢং আওয়াজ মিলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

—ভারি মুশকিলে পড়লাম ! এবার আপনার সঙ্গে আর কি কথা ওয়া যায় বলুন দেখি ? কিন্তু যাই বলুন, সেদিন আপনাকে যে

কমটি দেখেছিলাম আজ তার অর্ধেক চেহারাও আ... উঠে
গরি রোগা হয়ে গেছেন ! সত্যেন কি আজকাল আপনাকে
ত্নটত্ন করে না ?

সুলতা একটু বিপন্ন, একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।

—সত্যি, আপনারা আমাদের সমস্ত জীবন-ধারণের মূলে
য়েছেন। আপনাদের অবজ্ঞা করা, আপনাদের অযত্ন করা,—এ
আমাদের সইবে না !—বলতে বলতে উপেন উত্তেজিত হয়ে উঠল—
মেয়েদের ওপর আমরা কতদিক দিয়ে কত রকমে অন্যায় করি বলুন
ত ? তাদের মাথা তুলতে দিই না, তাদের মনের কথা বলতে দিই না,
তাদের আঘাত ক'রে আনন্দ পাই, তাদের বেদনাকে ব্যঙ্গ করি,
পায়ে পায়ে তাদের ভুল বুঝে শাস্তি দিই, উদাসীন হয়ে তাদের ওপর
অবিচার করি, নিষ্ঠুরের মতন তাদের দু'পায়ে মাড়িয়ে যাই ! যাই
বলুন, এসব সত্যেনের ভারি অন্যায় ! খাওয়া-দাওয়া হয়েছে
আপনার ?

মুখ তুলে তাকাতেই বড় বড় দু' ফোঁটা চক্‌চকে চোখের জল
সুলতার গালের ওপর গড়িয়ে এল।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে উপেন চুপ ক'রে রইল, তারপর পরম
আগ্রহে নিতান্ত কাছে সে সরে এল। বলল—জল ! চোখে আপনার
জল ? কি হয়েছে বলুন ত ? এত বড় দুঃখ আপনার মধ্যে, এতক্ষণ
আমার কাছে চেপে ছিলেন ? আপনাকে সান্ত্বনা দেবো, এত বড়
ভাগ্য আমার নেই, চুপ ক'রেই হয়ত আমাকে বসে থাকতে হবে,
কিন্তু—

এতখানি সহানুভূতি, এতখানি আন্তরিকতা সুলতা অনেকদিন
পায়নি। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল—আপনার কাছে সব
কথাই বলতে পারি। আমি কারো কাছে কিছু লুকোতে পারি না !

বলবেন বই কি, নিশ্চয় বলবেন। দেখুন, ভাল লোক আমি
হয়ত নাও হতে পারি, কিন্তু—কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে, মেয়ে-
দের চোখের জল আমাকে চিরকাল চঞ্চল ক'রে তোলে ! আমার

কম সত্যের ধারণা নেই, কোনো ধর্মবোধ নেই, একটা
নো বিশেষ মতামত বা বিশ্বাস নিয়ে আমি চলিনে, কোনো
তিষ্ঠাও নেই আমার—নিতান্ত সাধারণ বাঙালীর ছেলের মতই ঘুরি-
রি, এখানে ওখানে যাই, হুজুগ নিয়ে ঘর করি, দুর্বলতাকে প্রশ্রয়
, দুরাশাগুলো নিয়ে মনে মনে মালা গাঁথি, জীবনটাকে প্রতিদিন
র কাজে, বাজে কথায় একটু একটু ক'রে খইয়ে দিই—

সুলতা তার নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তির প্রতি তাকিয়ে ছিল।

উপেন বলতে লাগল—হ্যাঁ বুঝেছেন, ঠিক এমনি ক'রেই আমার
চলে যায়। কোনো কাজ নেই, অকাজের বোঝা টেনে টেনে
বেড়াই। বড় জিনিসের আস্বাদ কোনোদিন পাইনে, মনের
। কাকে বলে জানিনে—মানুষ কেমন ক'রে কোন্ পথে বড় হয়ে
তা আমার কাছে স্বপ্নের মত! ভালবাসা নেই, মমতা নেই—
দর সংস্পর্শে কোনোদিন আসিনি বলে নিজের সঙ্গেও ভাল
পরিচয় হল না—

ঠাৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে উপেনের চমক ভাঙল।
র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সে বলল—তাইত, হ্যাঁ—কি
লছিলাম। আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন! মুছুন, চোখের জল
লুন, ও আমি সইতে পারিনে!—আচ্ছা বেলা চারটে বাজে,
আপনার খাওয়া-দাওয়া,—বলুন ত দেখি আপনাদের কি হল?
আগ্রহাতিশয্যে, মমতায়, করুণায়, পরার্থপরতায় সুলতা
মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। অন্তরের কোনো
আর তার রইল না। ধীরে ধীরে অকপটে মৃদুকণ্ঠে সে মুগ্ধ
মৃত হয়ে এতদিনের সমস্ত ঘটনাগুলি বলে যেতে লাগল।
তার গলা বুজে আসছিল, বেদনার আবেগ তাকে দিশেহারা
ছিল, চোখের জলে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল—তবুও তাকে কিছু
বলতে হল। তার মধ্যে দ্বিধা ছিল না, অনাত্মীয়তা ছিল
—সরল সহজভাবে নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথাগুলি বলতে

চমক যখন ভাঙল, তখন সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। উঠে দাঁড়াতেই সুলতা বলল—শুনলেন ?

উপেন তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলল—অন্য সময় আবার আমি আসবো !

দরজা পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে সে নামল, এক মুহূর্ত একবার ...কে দাঁড়াল, তারপর আবার ভিতরে এল। দরজার কাছে সুলতা ...ড়িয়েই ছিল, পকেট থেকে একমুঠো টাকা ও নোট বার ক'রে ...নোরকমে তার হাতে পুরে দিয়ে উপেন বলল—এখন এতেই ...য়ে নিন, বাড়ী গিয়ে মানুর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ; তার পর ...ত্যেনের সঙ্গে দেখা হলে—

বলতে বলতে সে বেরিয়ে আসতেই সদর দরজার কাছে একেবারে ...ত্যেনের সঙ্গে মুখোমুখি।

মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে সত্যেন বলল—এ কি হে, চোখে ...র জল কেন ? বুড়ো বয়সে এ আবার কি ?

আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে উপেন বলে উঠল—তুমি মানুষ নয়, ...র কোনো বিবেচনা নেই ; মায়া-দয়া নেই, তুমি মেয়েদের ...ন দিতে জানো না ; তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কাপুরুষ, তুমি—

...ীরবেগে উপেন বেরিয়ে চলে গেল।

তার পথের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে সত্যেন আস্তে- ...স্তে ভেতরে এল, হঠাৎ সুমুখে দরজার কাছে সুলতাকে দাঁড়িয়ে ...তে দেখেই সর্পাহতের মত এক-পা সে পি...য়ে গেল, বলল— ..., তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ? ও—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে, আর উপেন ...ক্ষণ—এই যে বৈঠকখানার দরজাও খোলা। তাই ত বলি, ...পনের এ নাটুকেপনার মানে কি ! কান্নাকাটি ত হলই দেখতে ...চ্ছি, তা ছাড়া—বারে, হাতে যে টাকাও দেখছি। বকশিশ দিল ...কি ? ক' টাকা ?

টাকাগুলি সুলতার হাত থেকে ছড় ছড় ক'রে ছড়িয়ে ...ড়ল।

দুটি দিন পার হয়ে গেছে।

এত বড় আঘাত সুলতা সইলও যেমন অতি সহজে, ভুলতে তার তেমনি দেরি লাগল না। শিশু যেমন মার খেয়ে একবার কাঁদে আবার হাসে, আবার খেলাধুলায় মন দেয়, সুলতাও তেমনি আপনা প্রকৃতি অনুযায়ী আবার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রতি মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বোধ করি কিছু তার মনেই রইল না।

মানুর মা দিনরাত্রিই প্রায় থাকে। একা এই নির্বোধ সরল স্বাধ বুদ্ধিহীন মেয়েটিকে ঝড়-ঝাপটার মধ্যে ফেলে সে চলে যেতে পারেনি সন্তানের মা সে! বাজার ক'রে আনে, বাসন মাজে, রান্না-বান্না করে,—আবার সময় মত কাছে এসেও বসে।

—তা বাছা, এ আর আমার চোখে সইবে না কেন বল? স্বামী দুটো ধমকালো, দু'ঘা রাগের মাথায় বসিয়ে দিল—এ এমন হয়ে থাকে! তবে কি জানো মা, খুন-খারাপি আমরা সইতে পারি নে আমাদের গায়ের রক্ত চন্ চন্ ক'রে ওঠে।

মানুর মাকে ভোলাবার জন্য সুলতা একটু-আধটু পূর্বস্মৃতি-ক বলবার চেষ্টা করে।

—বুঝলে মানুর মা? ওঁর যে কি রকম সংসার করবার সখ তোমায় বলতে পারি নে! কতদিনের কত রাত যে এই নি আমাদের কথাবার্তা হয়েছে, তা মনে করতে গেলে হাসি পা মানুর মা, অমন মানুষ তুমি আর কোথায় দেখতে পাবে না!

—তা বাছা, তোমার সোয়ামীর আমি নিন্দে ত করিনে, কাজে নিন্দেই কচ্ছিলাম!, তা ধর তুমি যদি সব সইতে পারো তাহ'লে আমার গায়েই বা জ্বালা ধরে কেন বল!

—না তাই বলছি, এই মানুষটিকে আমি চমৎকার চিনি,—ম মনে ওঁর কথা ভেবে আমি এক এক সময়ে অবাক হয়ে থাকি! ক

ত্যায় আমার সহ্য করেছেন বল দে

বুঝতাম, না জানতাম, উনিই ত ধরে ধরে—

স্বামীর প্রতি এই অকপট এবং সরল উচ্ছ্বাস

পারে না। উঠে যাবার সময় বলে—ভাল হলেই-

তোমার জিনিস তোমারই থাক এই ত সবাই চায়! তা

স্বামীর গুণ গাওয়াটা কি সবার সয়?

সুলতা চুপ ক'রে থাকে। কেমন ক'রে সে বোঝাবে সত্যেন তার কতখানি! তবুও মানুর মা'র পরার্থপরতার কাছে মাথা তার নত হয়ে আসে। এই অনাত্মীয় পরিচারিকার প্রতি সমস্ত স্নেহ-মমতা তার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

—অ বৌমা, শোনো বাছা, একবার নীচে যাও, সদর দরজায় গিয়ে একবার দাঁড়াও!

সুলতা বলল—ওঁকে বুঝি কেউ ডাকতে এল কাজের জন্যে?

—ওঁকে নয়, তোমাকে। উপেনবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

—উপেনবাবু? যাই!

তর তর ক'রে সে নীচে নেমে এল। দরজার কাছে আসতেই অদূরে দাঁড়িয়ে উপেন বলল—ছুদিন আসিনি ইচ্ছে ক'রেই, কেন এমন হল বলুন ত?

চন্দ্রের গায়ে কলঙ্কের মত সুলতার হাতে মুখে তখনও দড়া দড়া দাগ ফুটে রয়েছে। ধীরে ধীরে সুলতা বলল—আপনি ত সেই চলে গেলেন···টাকা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে দেখে,—আমাকে উনি বিশ্বাস করলেন না!

—কোথায় সে?

—এখন নেই। ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে যান, আবার আসেন ঢের রাতে! তিনি কারো মুখ দেখেন না।

—ও। রাতেও দেখা হয় না আপনার সঙ্গে?

—উঁহু; না—তিনি থাকেন তেতলার ঘরটায়। ডাকতে গেলে দেন না, স্নান্ না কিছুই। আমি তাঁকে দেখতেই পাই না।

দুটি দিন পার হলেও উত্তর দিতে পারল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বলল—
এত বড় আন্দএসে বসুন।

ঠার তেমনি, আর ভেতরে নয়—উপেন বলল—আমরা এক চাবুকের খাবার হ, সোজা কথাটা আমরা সোজা ক'রেই বুঝি। মেয়েদের ওপর যেখানে এত বড় অপমান, এত বড় কাপুরুষতা অবাধে চলতে পারে, অন্যায়ের যেখানে কোনো প্রতিকারই নেই—আমি সেখানে স্থান করতে পারিনে। আমার অনেক দোষ আছে বুঝলেন, কিন্তু অন্দরে বীরত্ব প্রকাশ করবার ইতরোমো আমার নেই।

কষ্টে রাগে আক্ষেপে উপেনের গলা ভারি হয়ে এল।

সুলতা মাথা হেঁট ক'রে রইল। স্বামীর কৃতকর্মের জন্য সে-ই যেন দায়ী। সুতরাং উপেনের তিরস্কারকে সে শ্রদ্ধা না ক'রে পারল না।

উপেন বলল—খবরটা শুনে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ কি হতে পারে ? সত্যেন এই করল ? মেয়েদের অতিরিক্ত সম্মান করার জন্য বরাবর সত্যেনকে আমরা ঠাট্টাই ক'রে এসেছি। স্ত্রীলোকের নামে তার মাথা নুয়ে পড়ত, মেয়েদের ওপর সমাজের নানা অত্যাচারের জন্য কতদিন সে কত বক্তৃতা [illegible]য়েছে, কত লোকের সঙ্গে কত লড়াই করেছে, কত জায়গা[illegible] বদনাম কুড়িয়েছে,—তার এই কাজ ? হায় রে, আলোর নীচেই ঘোর অন্ধকার।

সুলতা বলল—ভাল হয়ে উঠলে ওঁকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারি।

—বুঝিয়ে বলবেন ? আপনি ? এ অপমান ভুলে গিয়ে আ[illegible] আপনি তাকে,—অবশ্য আমি ত বাইরের লোক, আপনাদের ভেতর কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করার দরকার কি আমার। বেশ, এখন[illegible] মত আমি চললাম। যদি কিছু অন্যায় বলে গিয়ে থাকি তার মার্জনা করবেন।

মুখ ফিরিয়ে রাস্তায় নেমে উপেন তাড়াতাড়ি চলে গেল।

দাঁড়িয়েই রইল, মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে সে কেঁদেই চলল! বৃষ্টিতে ততক্ষণে তার কাপড়-চোপড় ভিজে উঠেছে!

দূরে কোথায় একটা বাজ পড়ার শব্দে সে সজাগ হয়ে সরে এল। এ কি, এ যে অন্ধকার! স্বামী কি তার ঘরে ফিরেছেন? এ দুর্যোগে তিনি রইলেন কোথায়?

সুলতা আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না। একটা চাদর টেনে গায়ে-মাথায় মুড়ি দিয়ে সে নীচে নেমে এল। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সে রাস্তায় একবার উঁকি মারলে। এক-আধটা গ্যাসের আলো মাত্র সেখানে জ্বলছে। জন-মানব কেউ নেই! অনেক দূরে ছাতি মাথায় দিয়ে একজন পথিক তাড়াতাড়ি চলেছে। সুলতা একবার তাকে ডেকে সত্যেনের সংবাদ জানবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখের আওয়াজ মুখেই রয়ে গেল।

নিরুপায় হয়ে সে ধীরে ধীরে পথে নামল। বাঁ-দিকের রাস্তাটা সোজা মনে ক'রে সেই পথেই চলল। একাকিনী পথে চলার কোনো সঙ্কোচ তার বিবেচনায় এল না। সত্যেনের খোঁজ করা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাই তখন তার মাথার মধ্যে নেই! পথে যেতে যেতেই যেন তার স্বামীর দেখা পাবে!

চলছে ত চলছেই! অনেক দূর অবধি গিয়েও কোনো চিহ্নই তার চোখে পড়ল না। পথটা একটা বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলল। অতএব এ-পথ নয় মনে ক'রে সে আবার ফিরল। বৃষ্টিতে ভিজল, কাদায় পা ডুবে গেল, আঙুলে হোঁচট লাগল—কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সত্যেন তখন তার মনের দীর্ঘ দিগ্বলয়টি জুড়ে রয়েছে।

এক জায়গায় এসে সে থামল। কাছেই কোথায় নারীকণ্ঠের সুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গান সে বহুদিন শোনেনি। গীত যে তার সকলের চেয়ে প্রিয়, এ কথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। এই বৃষ্টি বাদল, এই অন্ধকার, এই একাকীত্ব এবং সকলের উপর এই খোলা পথের কিনারায় এমনি সামান্য রস-পিপাসায় দাঁড়িয়ে

থাকা,—গৃহস্থের বধূর পক্ষে এ যে নিন্দনীয়, এ কথা তার এতটুকু মনে রইল না। আনন্দে তার চক্ষু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, সঙ্গীতের মাধুর্যে সর্বাঙ্গ তার রোমাঞ্চিত হয়ে এল, গায়ের রক্তের মধ্যে একটি উন্মাদনা সির্ সির্ করতে লাগল,—মনে হল, ভিতরটা যেন তার নৃত্য করতে সুরু করেছে! তার লজ্জা, ভয়, অপমান, সুখ-দুঃখ—সমস্ত কিছু গ্রন্থি একে একে তার গা থেকে যেন খুলে খুলে খসে পড়তে লাগল।

—আপনি কি রাস্তা হারিয়ে গেছেন?'

পরিচিত গলার আওয়াজে ফিরে তাকাতেই একেবারে উপেনের সঙ্গে মুখোমুখি।

—এ কি, আপনি? এখানে? এখানে দাঁড়িয়ে কি জন্যে?

মাথার কাপড়টা খুলে গিয়েছিল, সুলতা কাপড় টেনে মাথায় ঢাকা দিল।

—পথে এত রাতে,—আপনি মেয়েছেলে হয়ে,—ওদিকে কি দেখছিলেন? ছি, এখানে দাঁড়াতে নেই,—আসুন না, এই ত আমার বাড়ী। আমার বাসাই বুঝি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?

সুলতার আর বাক্‌শক্তি ছিল না। আস্তে আস্তে উপেনের পেছনে পেছনে এসে দরজায় উঠল। দরজা ভেজানোই ছিল, দুজনে ভেতরে এসে বাইরের ঘরে ঢুকল। সুইচ্‌টা টিপে আলো জ্বেলে উপেন বলল—এমন আশ্চর্য জীবনে আমি আর কোনোদিন হয়নি। এই রাতে রাস্তায় যে আপনাকে কুড়িয়ে পাওয়া যাবে, এ স্বপ্নের অতীত। আমার এখানেই কি এসেছিলেন?

সুলতা এবার কথা বলল—ওঁর আজ দুদিন খোঁজ নেই। চুপ ক'রে তাই আর থাকা গেল না।

—ও, আপনার স্বামীর কথা বলছেন। কিন্তু এই দুর্যোগে··· আপনি স্ত্রীলোক···ঘরের বাইরে বেরোনো কি উচিত হয়েছে? আপনার কি ভয়-ডর নেই? ঘরে বুঝি মন টেঁকছিল না?

—গিছলাম অনেক দূরে—সুলতা বলল—তারপর এই দিক দিয়ে আসতে আসতে···কেমন গান হচ্ছে শুনলেন না?

—গান আমি রোজই শুনি। আজ একটু বেরিয়েছিলাম···বাড়ীতে আজ কেউ নেই, সবাই নেমন্তন্নে গেছেন, মান্নুর মা বোধ হয় ওপরে ঘুমুচ্ছে। পথে আসতে আসতে বিষ্টি এল, তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। এলাম আপনার দরজার সুমুখ দিয়েই।

অবস্থা উপেনের ভালই, সুসজ্জিত ঘরখানির চারিদিকে তাকালে এই কথা মনে হয়। একটি পরিচ্ছন্ন আধুনিক জীবনের ছাপ রয়েছে।

—খোঁজ ত পেলেন না, এবার কি করবেন।

—এবার? সুলতা বলল—তাই ভাবছি?

উপেন বলল—আপনি অদ্ভুত! সেদিন আপনার ওপর বোধ হয় একটু রাগ ক'রেই চলে এলাম। কিন্তু আজ এই বর্ষায়, অন্ধকারে, এই এক্‌লা ঘরে আলোর নীচে, সবার চোখের আড়ালে আপনার উপর আর সে রাগ থাকছে না! আচ্ছা, এমন কেন হয় বলুন ত দেখি?

সুলতা শুন্‌ল, শুনে গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল—আমিও সেই কথা বলব আপনাকে ভেবেছিলাম।

একটু ঝুঁকে পড়ে উপেন বলল—কি?

—না, এই ওঁর কথা বলছি। বলছিলাম ওঁর ওপর রাগ করতে নেই! সব সময় ওঁকে আমরা বুঝতে পারি না তাই এক এক সময় রাগ ক'রে বসি। ওঁকে যে জানে সে আর কাউকেই চাইবে না!

—ও, এই কথা!—উপেন উদাস হয়ে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো একটি তৈল চিত্রের প্রতি তাকিয়ে রইল। দুনিয়ায় তার আর যেন কোনো স্পৃহাই নেই।

—দেখুন, আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, ওঁর কথা আর আপনি মনে রাখবেন না!

উপেন একটু ম্লান হাসি হাসল। বলল—আমাকে আর লজ্জিত করবেন না, ব্যাপারটা হল আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আমি ত পর, বাইরের লোক, আমার ভারি খারাপ লেগেছিল তাই দু'চার কথা, —আপনার যে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে! এবার না হয় উঠুন আস্তে আস্তে।

ওঠবার কোনো লক্ষণই সুলতার দেখা গেল না। বরং উপেনের মনের ওপর আর-একটু দাগ রাখবার চেষ্টায় সে বলল—কি রকমভাবে। উনি দিন কাটাচ্ছেন মনে করলে আমার সত্যিই কান্না পায়। সবই আমার দোষ, আমার জন্য তাঁকে এত দুঃখ পেতে হল!

এই মেয়েটির উপর বিতৃষ্ণা জাগাই উচিত ছিল কিন্তু অপরিসীম মমতায় উপেনের মনটা ভরে উঠতে লাগল। বলল—দোষ যদি আপনার হয়েই থাকে, তার ক্ষমা করা উচিত। আপনাকেও সে ভাল ক'রে চিনতে পারে নি!

একটি অপূর্ব আনন্দে এবার সুলতা চঞ্চল হয়ে উঠল! বলল—এই হচ্ছে ঠিক কথা, আপনি ছাড়া এ কথা আর কেউ বলতে পারত না। আমার নিজের কথা অন্য কেউ বললে আমার খুব ভাল লাগে। এই জন্যই আমি আপনাকে—

উঠে দাঁড়িয়ে সুলতা ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেওয়ালের ছবিগুলি দেখতে লাগল।

ভিজা কয়েকগাছি চুল তার মুখের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, মুখের একটা পাশ দিয়ে টানা চোখের একটা ধার দেখা যাচ্ছিল,—সে চোখ আগেকার মতই কাজলের রেখা টানা। হাত দুখানি নিটোল, মসৃণ, চাঁপার কলির মত আঙুলগুলিতে লাল আভা। তারই আগায় দুগাছি চুড়ি চিক্ চিক্ করছে। পায়ের আলতাপাটিতে কাদা লেগে কাদাও চিরকালের মত ধন্য হয়ে গেছে!

অনেকখানি সঙ্কোচ সত্ত্বেও উপেন তার দিকে এক-একবার মুখ না ফিরিয়ে থাকতে পারছিল না।

বাড়ীত আপনাকে ফিরতেই হবে, না কি?—উপেন বলল—এখানেও একা সেখানেও একা!—

যারা নিমন্ত্রণে গিয়েছিল তাদের ফেরবার সময় হয়েছে। উপেন তাড়াতাড়ি বলল—চলুন, আপনাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। কেউ এসে আপনাকে এখানে দেখলে—আমার চরিত্র সম্বন্ধে আমার আত্মীয়-স্বজনের ধারণা তেমন ভাল নয়।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দু'জনে বাইরে এল। ঝুম্‌ তখন ধরে গেছে—আকাশে আর মেঘ নেই! তারা জ্বল জ্বল করছে

পাশাপাশি চলতে চলতে ভিজেচুলের গন্ধ উপেনের নাকে আসতে লাগল। নারী অঙ্গের একটি মৃদু সূক্ষ্ম সৌরভ তাকে একটু একটু ক'রে বিহ্বল ক'রে তুলছিল।

কম্পিত কণ্ঠে উপেন পথ চলতে চলতে বলল—এমন ক'রে আর ক'দিন চলবে আপনার? কি আশায়, কি লক্ষ্য নিয়ে আপনার দিন কাটবে বলতে পারেন?

স্থলতা অন্ধকার আকাশের বহুদূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখল কিন্তু কোনো উত্তরই আর মুখে এল না।

বাড়ীতে তাকে পৌঁছে দিয়ে এসে উপেন সহজে আর ফিরল না। সেই রাতে লক্ষ্যহীন হয়ে অনেক দূর সে হেঁটে গেল। হাঁটতেই তার ভাল লাগছিল। যে বস্তুটি তাকে ঘর ছাড়া করেছে, পথ চলে চলে সে তাকে খইয়ে দিতে চায়। এ তার আনন্দের আবেগ, কি বেদনার বোঝা কে জানে! অনুভূতির সমস্ত তারগুলি একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠে তাকে যেন বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ বাতাস, আলো, অন্ধকার—সমস্ত একাকার ওলটপালট ক'রে তার চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল।

সে-রাতে আর তার ঘুম হল না। খোলা ছাদের ওপর পায়চারি ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে সে যখন কিছু প্রকৃতিস্থ হল,—গগনের পূর্ব-প্রান্ত তখন লাল হয়ে উঠেছে। শুকতারাটি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল।

স্পষ্ট আলোয় চারিদিক যখন ছেয়ে গেল, উপেন তখন গত রাত্রির বিভ্রান্ত মনের কথা ভেবে লজ্জিত হয়ে উঠল।

খানিক বেলায় সে যখন চা খেয়ে সবেমাত্র উঠেছে, মানুর মা তখন ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

উর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে বলল—সময় নেই, আপনি এখুনি একবার চলুন বৌমার কাছে।

—কেন মানুর মা?

বৌমা ডাকছেন, আমি চললাম···আর দেরি করবেন না···বলবার সময় নেই।

মানুর মা ছুটতে ছুটতে আবার বেরিয়ে চলে গেল। জুতোটা কোনোমতে পায়ে দিয়ে উপেন পথে নেমে বলল—আরে দাঁড়াও মানুর মা, দাঁড়াও—কি হল শুনি? কোথাও কিছু নেই, তুমি একেবারে ঘোড়ায় চড়ে এসে···ও মানুর মা?

—ওই আপনার দোষ বাবু, পিছু ডাকা···আসুন বলছি!

বাড়ীতে ঢুকে সটান্ গিয়ে উপেন ওপরে উঠল। সুলতা শশব্যস্তে এসে কাতর কণ্ঠে বলল—বাড়ীতে ফিরে কাল তেতলার ঘরে দুম্দাম্ শব্দ শুন্‌ছিলাম···উনি ওই ঘরেই থাকেন কিনা, অতটা বুঝতে পারিনি ···দরজা বন্ধ, কিছুতেই খুলছেন না—এত ডাকাডাকি—কোনো সাড়া নেই। কাল আপনার ওখানে যখন গিছলাম উনি বাড়ীতেই ছিলেন—টের পাইনি।

তেতলায় উঠে এসে উপেন দরজায় ধাক্কা দিল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেও দরজা খুলল না। পাশের বাড়ী থেকে অনেকেই উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

উপেন বলল—কি করা যায়?

মানুর মা বলল—সবাই যা করে! দরজা না ভাঙলে এমন ক'রে ত আর থাকা যায় না! ভ্যালা সোয়ামী তোমার বৌমা! এত কষ্টও মানুষকে দিতে হয়?

দরজা ভাঙাই সাব্যস্ত হল। সাবল হাতুড়ি সাঁড়াশি এনে অনেক পরিশ্রম অনেক হুড়যুদ্ধ অনেক দাপাদাপির পর দরজা খোলা হল।

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে!

ঘরের সমস্ত আসবাবগুলি চূর্ণবিচূর্ণ, ভাঙা কাঁচ রাশি রাশি চারিদিকে ছড়ানো, আলমারি ওল্টানো, জলের কুঁজো গড়াগড়ি, বিছানাপত্র লণ্ডভণ্ড,—আর তারই মাঝখানে খাটের ওপর থেকে আধখানা দেহ ঝুলিয়ে সত্যেন অর্ধনগ্ন অবস্থায় বেঁকে চুরে কাত হয়ে রয়েছে!

পৃথিবীর আলো-বাতাস সে আর সইতে পারেনি, আপনজনের চিরদিনের মত নির্বাসন দিয়েছে, সংসারকে সে কঠিন ব্যঙ্গ করে গেছে,—মানব জাতির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় তার সেই ভয়ানক কদর্য মুখভঙ্গী তখনও বিকৃত বিবর্ণ হয়ে ছিল। পুড়ে পুড়ে প্রতি মুহূর্তে সে খাক্ হয়েছে, ঘৃণায় ঘৃণায় প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু তার বিষাক্ত হয়েছে, নিজের দেহই তাকে প্রতি পলে পলে নির্যাতন করেছে! জীবনের বোঝা সে আর বইতে পারেনি!· বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কি উপায় ছিল!

—কি দেখছেন? ও আর নেই।

সুলতা মুখ তুলে তাকাল। তার চোখের পাতা কাঁপছিল।

ঘাড় ফিরিয়ে উপেন পিছন দিকে তাকাতেই, মানুর মা'র চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল।

॥ ৫ ॥

শবদেহের সৎকার ক'রে অনেক বেলায় উপেন সুলতাকে নিয়ে ফিরে এল। হাতের চুড়ি দুগাছি মাত্র আছে, পরনে উঠেছে আপাতত সাদা থান, যে-সিঁদুর সত্যেন তার মাথায় আবার তুলে ছিল, সে-চিহ্ন আর নেই! চির-পরিচিত বিধবার সজ্জায় সে আবার [illegible] প্রকাশ করল।

ঝড় থেমে গেছে—। আর বিদ্যুৎ চমকায় না, মেঘ আর ডাকে না, মুষল-বৃষ্টিপাত আর হয় না। বাইরের সমস্ত দুর্যোগটা যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে ভিতরে মুহ্যমান হয়ে আছে।

মৃত্যু-যে শিকড়সুদ্ধ একটি গাছকে টেনে উপড়ে নিয়ে গেছে তারই অস্ফুট বেদনায় সমস্ত বাড়ীখানা এখনও টন্ টন্ করছে। শোকের আওতায় চারিদিকটা ভারি,—থমথমে! এ বস্তু ঠিক বিরহ নয়, বিচ্ছেদও নয়—এ হচ্ছে নিয়তির একটি অভিব্যক্তিহীন নিষ্ঠুরতা! এ

—কেন নয়—হত্যা ; ত্যাগ নয়—লুণ্ঠন ! মানুষ-যে শুধু এর জন্যে বৌয়ের জল ফেলবে তাই নয়—গৃহের চূড়ায় ক্লান্তিহীন কপোতের কণ্ঠ নিরন্তর এর প্রতিবাদ ক'রে চলেছে, শীর্ণ শুষ্ক পত্রের মর্মরে এর ক্রন্দন-ধ্বনি শিউরে শিউরে উঠছে, উদাস দুপুরের হাওয়ায় হাওয়ায় এর নিশ্বাস ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে যাচ্ছে ! পলাশ ফুলের পথের কিনারা দিয়ে, অশোক আর শিমূলের বন পার হয়ে, রাঙা করবীর রেখা এঁকে এঁকে দস্যু একটি জীবনকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। রক্তের দাগে সে পথ কলঙ্কিত !

শোকাচ্ছন্ন গৃহখানির করুণ আবহাওয়া মানুর মা'র কাছেও মাঝে মাঝে দুর্বহ হয়ে ওঠে, নিয়তির এত বড় অন্যায় সময় সময় তাকেও অকারণে চঞ্চল ক'রে তোলে। নির্জন গৃহের নীরবতায় মানুর মা সহজে টিক্‌তে পারে না।

কিন্তু সমবেদনা প্রকাশ করবারও এ যে উপযুক্ত সময় নয়, এখন যে তার কোনো মূল্যই নেই এ কথা মানুর মাও না-জানি কেমন ক'রে বুঝতে পারে! থেকে থেকে এক সময় সে বলে ওঠে—শুনচ? অ-বৌমা, একটু নড়ে চড়ে ঘুরে ফিরে বেড়াওগে বাছা!

কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও সে দেখে বৌমা তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে। মুখ তুলে তাকাতেই সুলতার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়! কিন্তু তার দৃষ্টি ওই এক রকমের! তাতে অর্থ নেই, আবেগ নেই, নিরানন্দের কোনো স্পষ্ট অভিব্যক্তি নেই,—বর্ষায় ধোয়া আকাশের মত এক রকমের ফিকে ঝাপসা চাহনি। কারো প্রতি তাকালে সে চাহনি বেঁধে না, আহত করে না—সে এমনিই নিরর্থক এবং নির্বাক।

সাধারণ কাজ-কর্মগুলি সেরে কাছে গিয়ে মানুর মা বলল—এ রকম্ করলে দিন কেমন ক'রে যাবে বৌমা?

তা বটে! মানুর মা'র সাংসারিক বুদ্ধিকে সুলতা সম্মান না ক'রে পারে না। ভাগ্যি উপেনবাবুর এই ঝি-টি এ সময় ছিল!

যে-প্রশ্নটি নিরন্তর কাঁটার মত ভিতরে ভিতরে খচ্ খচ্ ক'রে

গেছি···জল ছল ছল করছে, নদীর ওপর বর্ষা নেমেছে, বটগাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর···উঃ, জলের ওপারে কী মেঘ জমে উঠেছে তা আর কি বলব,—যাঃ, নৌকোখানা ডুবে গেল বুঝি? জলের ওপর এত ঝড়-বৃষ্টি?

বলতে বলতে মুখে-চোখে সুলতার রক্ত জমে উঠল।

—তারপর বৌমা?

—তারপর দেখি তুমি দাঁড়িয়ে! মানুর মা—বলতে বলতে সুলতা মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

—কি বৌমা?

—দেখলাম তোমার পরনে রাঙা শাড়ী, মাথায় টক্‌টকে সিঁদুর, হাতে,—আর প্রতিমার মতন তোমার কী রূপ!

মানুর মা ততক্ষণে আড়ালে চলে গেছে। আড়ালে গিয়ে লজ্জায় এতখানি জিব বার ক'রে মনে মনে বলল—ছি ছি, বৌমার মুখে কিছু আট্‌কায় না, বিধবা মানুষকে···রাম রাম!

—ও মানুর মা, শুনচ? আবার যে বাতাস উঠল—যাঃ, দিলে বুঝি সব ওলোটপালোট ক'রে। যাই—

ছুটতে ছুটতে ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে জান্‌লা দরজা বন্ধ ক'রে দিতে লাগল। চোখে ততক্ষণে তার ঝর ঝর ক'রে জল নেমে এসেছে!

মানুর মাকে নিয়েই তার দিন, মানুর মাকে নিয়েই তার রাত। সমস্ত দিন ধরে মানুর মা'র কাছে যে-কথাগুলি সে শোনে, অতি নিভৃত সঙ্গোপনে সেগুলি তার ভিতরে গুঞ্জন করে; মানুর মা'র কর্ম-জীবন নিয়েই এখন তার যত আলোচনা, মানুর মা'র আত্মকাহিনীই এখন তার জীবনের গীতা! মনে হয়, সভ্য-সমাজের উপেক্ষিতা এই স্ত্রীলোকটির ছোটখাটো দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে তার অন্তরে একটি সূক্ষ্ম এবং নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে! পরের প্রতি মানুর মা'র এই অনাহূত মমতার নিষ্ঠা এর কাছে শ্রদ্ধায় সুলতার মাথা অবনত হয়ে আসে।

যেমন বোঁটাকে আশ্রয় ক'রে চলতে থাকে সুলতা, তেমনি মানুর

-াকে আশ্রয় ক'রে দিন কাটায়। সমস্ত দৃষ্টিকে ছেয়ে মান্নুর মা-ই সংসারে এখন তার একমাত্র অবলম্বন।

সন্ধ্যার সময় উপেন রোজই একবার ক'রে ঘুরে যায়। সুলতা তার কাছে যেন একটি সুকঠিন প্রশ্ন! প্রতিদিন এই প্রশ্ন জটিলতর হয়ে তার কাছে দেখা দেয়। এর উত্তর আর আবিষ্কৃত হয়ে ওঠে না।

শোবার ঘরের একটি চৌকির ওপর বসে পড়ে সে বলে—হিঁদুয়ানি আপনার নেই দেখছি, এক পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা থাকলে তবু যাতায়াতের একটা কারণ বোঝা যেত।

সুলতার আড়ষ্ট জিবটা সামান্য একটু আলগা হয়। বলে—এই গরমে চা?

ওই একটি জিনিস—বুঝলেন? আমাদের মতন পথো-জীবকে বাঁচিয়ে রাখে। উপুসি ছারপোকা, ওটা দিয়ে নাড়িভুঁড়িগুলোকে একটু সতেজ রাখি। তা ছাড়া ওটা ত ঠিক আহার নয়, নেশা। নেশার কি আর সময়-অসময়, গ্রীষ্ম-বর্ষা আছে?

—চা খাওয়াটা তেমন ভাল নয়!

—নয়? বলেন কি? বদ্ উত্তেজনা আনতে, দেহটাকে বারুদের মতন তৈরী করতে, খেয়ালের প্রশ্রয় দিতে অমন আর নেই।

—তাতে লাভ কি বলুন।

—বাস রে, আজ অনেক কথা ভাঙচেন যে! আমাকে একবার নাড়া দিলে অনেক কথা ঝরে পড়ে। লাভ আছে বইকি, আমরা হচ্ছি ভবঘুরে বাউণ্ডুলের দল,—বন্ধু, স্ত্রী, বৌদি কিংবা মামাতো-পিসতুতো বোনের দলে গিয়ে আসর জমাতে হয়, প্রেমের একটু-আধটু চর্চাও মাঝে মাঝে চলে—চায়ের নিভৃত আসর নইলে এগুলোর সুবিধে কোথায় বলুন! চা হচ্ছে আজকালকার আধুনিক প্রেমের অনুপান!

সুলতা একটুখানি হাসল। বর্ষায় ভেজা আকাশে যেন একটু রোদ খেলা ক'রে গেল।

—এসেছিলাম, যাই এবার! ভয় হয়, পাছে মান্নুর মা গোয়েন্দা

গিরি করে। সাজ-গোছ ক'রে বাড়ী থেকে সন্ধ্যাবেলায় বেরোলাম, অথচ বেরিয়েই মনে হল, তাই ত, যাই কোথায়। বন্ধুর বাড়ী? রাম বল! সরকারি বাগানে? ছি ছি, শেষকালে চাঁদের আলো দেখে রাত কাটবে? সত্যি বলছি আপনাকে, রাতের বেলা চাঁদ উঠলে মুখচোরা হাওয়া বইলে মনে হয় পৃথিবীটা যেন মূর্তিমান ন্যাকামি! পৃথিবীর বাইরে কোনো রকমে যদি একবার যেতে পারতাম ত ধরিত্রী দেবীর গালে একটি সজোরে চপেটাঘাত ক'রে আসতাম।

সুলতা বলল—আপনার সাহস ত কম নয়!

উপেনও হাসল—হেসে বলল—এটা সাহস নয়, পাগলামি! মাঝে মাঝে এমনি কতকগুলো পাগলামি আমার ঘাড়ে চেপে বসে। এর কোনো হদিস পাইনে। একটা অতৃপ্তি সমস্ত দেহের মধ্যে চরে বেড়ায়—হ্যাঁ, ঠিক এই রকম! কেবলই একটা অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে খচ্ খচ্ করছে! বোধ হয় এমন একটা কিছু চাই যা কোনো দিন ফুরোবে না, এমন একটা আনন্দ যার বৈচিত্র্য হারাবে না, পুরোনো হবে না।

—কি সেটা?

—হা ভগবান! মাথা নেড়ে উপেন বলল—তাই যদি জানব তা হলে আপনার কাছে যখন তখন এসে এমন বক্তৃতাই বা দেব কেন? যেটা চাই সেটা পাচ্ছিনে বলেই ত তার ওপর এত টান, এত দরদ, এত খোঁজাখুঁজি! যদি জানতেই পারব কী সেটা তবে ত সব গোলমালই মিটে যায়। এদেশে আমরা একদল পতিত সন্তান আছি, যারা ক্ষ্যাপার মত এই দুনিয়ার কূলে সারা জীবন ধরে পরশপাথর খুঁজেই সারা হল।

একটি অস্বস্তিকর নীরবতা কাটিয়ে সুলতা বলে উঠল—একটি সংসার করুন না?

—সংসার? তার মানে বিয়ে? হরি হরি, সংসারের দিকে সমস্ত মন পড়ে রইল কিন্তু ভোগ যে তৃপ্তি দিল না! পাখীর বাসা বাঁধব,

কিন্তু ঝড়ের কথাই যে আগে ভাবি। তা ছাড়া উধাও হয়ে যে উড়েছে চলল, বাসা ত তার পথ চেয়েই থাকবে!

—কিন্তু স্ত্রী কাছে থাকলে—

—স্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রীলোক?…ভাল লাগে না? স্ত্রীলোক শুধু বাঁধনের গানই গাইবে, মায়া রচনা করবে, কিন্তু আত্মার খোঁজ সে কি জানে! সে যে চীৎকার ক'রে ক'রে গলা চিরে রক্ত বার করছে, তাকে সান্ত্বনা স্ত্রীলোক দেবে কি ক'রে? সে কি স্ত্রী চায়? না ঐশ্বর্য চায়? তার কাছে সন্ন্যাসও মিথ্যে, ভগবানও কথার কথা!

উপেনের কণ্ঠে ছিল রসিকতার সুর, এখন এল গাম্ভীর্য! নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে মিলিয়ে যেতে লাগল।

সেদিন অনেকক্ষণ সে এমনি ক'রে কাটাল।

—উঠি তবে আজকের মতন,—আসি!—হাত-ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে ছড়িটা হাতে নিয়ে উপেন বাইরে বেরিয়ে এল।

—চা খাওয়া হল না যে?

উপেন পিছনে তাকিয়ে হাসল। বলল—সত্যি কি খেতাম? ও একটা ছুতো, নইলে আপনাকে দেখতে আসব কোন্ ছলে?

—আপনাকে বোধ হয় আলো দেখাতে হবে, ভারি অন্ধকার।

—আলো?—একটু হেসে উপেন বলল—না থাক্, পথটা আমার চেনা হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

রাত্রি অন্ধকার—। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুলতার চোখে সেদিন ঘুম এল না। ওর ঘর থেকে মানুর মা'র নাক ডাকার শব্দ থেকে থেকে কানে আসছিল।· আলোটা টিপ্ টিপ্ করছিল এতক্ষণ এবার নিবে গেল, নীচে কোথায় ঝিঁঝি পোকার মৃদু একঘেয়ে শব্দ অন্ধকারকে ক্ষত-বিক্ষত করছে!

সুলতা পাশ ফিরে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো। মনে হচ্ছিল. উপেনের এক-একটি কথা তার মনের প্রত্যেকটি তারে

আঘাত ক'রে ঝঙ্কার তুলেছে। উপেনবাবু লুকিয়ে থেকে নিজেকেই খুঁজছেন। এ খোঁজা কি তার শেষ হবে না? আহা বেচারী!

ভাবতে ভাবতে সুলতার চোখ বুজে এল।

গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল! শব্দ—হ্যাঁ, এইমাত্র খাটের সুমুখ থেকে দরজার গোড়া দিয়ে ওই যে পায়ের শব্দ বাইরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। সুলতা উঠে বসল। যে এসেছিল সে-যেন তার একটি নিশ্বাস ঘরের মধ্যে রেখে গেছে। দরজাটা বোধ হয় একটু নড়ে উঠেছিল; ওই যে তার গায়ের হাওয়া লেগে কাপড়খানা এখনও দুলছে। মেঝের ওপর পায়ের দাগ রেখে গেল কি? কি একটি কথা বলে চলে গেল, কণ্ঠস্বরটি সুলতা এখনও যেন অনুভব করতে পারে।

রাত্রির এই অন্ধকারে সে কি সুলতার বিছানার চারিদিকে নিঃশব্দে পায়চারি ক'রে গেল? দৃষ্টি কি তার করুণ-কাতর? আত্মা কি তার তৃষ্ণার্ত? হয়ত তার জীবনের সমস্ত দুরাশাগুলি পদ-দলিত হয়ে গেছে, হয়ত সে প্রেমের প্রচণ্ড অপমান সহ্য করছে—অসমাপ্ত ভোগের পিপসাকে চারিদিকে সে কি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে? চোখের জলও কি ফেলে গেল দু' ফোঁটা?

সুলতা উঠে আস্তে আস্তে বাইরে এল। অদৃশ্যের পদধ্বনি অনুসরণ ক'রে কয়েক পা এগিয়ে সে আবার ফিরে দাঁড়াল—কোথায় যাবে সে অন্ধকারে? কার পদধ্বনি?

পাশের ঘরে ঢুকে হেঁট হয়ে মানুর মা'র গা ঠেলে বলল—শুনচ, ও মানুর মা?

মানুর মা'র ঘুম বড় সজাগ। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে বলল—কেন গা বৌমা?

—রাত কি এখনও শেষ হয়নি? সকাল হবে কখন?

—সকাল হলে আমার আপনিই ঘুম ভাঙত, ডাকতে হবে কেন মা?

কি—তা বটে! সুলতা বলল—আজ তোমার খাওয়া হয়েছিল মানুর মা?

—ও মা ছি ছি—আজ যে একাদশী বাছা?

—তা বটে!

সকালবেলা উপেন আসেনি। বিকালবেলা আসতেই সুলতা বলল—আপনার অপেক্ষাই কচ্ছিলাম সারাদিন। আজ একটি সু-খবর আছে!

—কি?

—এই নিন্!—আঁচলের ভেতর থেকে একখানি চিঠি বার ক'রে উপেনের হাতে দিয়ে সুলতা আবার বলল—অনেক দিন বাদে দিদির খবর পেলাম!

চিঠিখানা খুলে উপেন সবটা পড়ল। দিদি আশীর্বাদ ক'রে পাঠিয়েছেন। অনেকদিন দেখা হয়নি, সত্যেন কেমন আছে, ছেলে-পুলে হল কি না—এই সব!

চিঠি বন্ধ ক'রে উপেন বলল—কি করবেন?

—যাব তাঁর কাছে। দিদিকে না দেখে আর থাকতে পাচ্ছি না।

—তাই চলুন, উপেন বলল—হাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে, একবার ভাল ক'রে নিশ্বেস নিন্ গে। কাল সকালেই কি যাবেন? ভোরের গাড়ীতে?

কথাবার্তার পর পরদিন ভোরের গাড়ীতেই যাওয়া স্থির হল।

—আপনাকে কিন্তু রেখে আসতে হবে, নইলে যাবে কে বলুন?

—তা যখন বলছেন তখন—আর আমি ছাড়া লোকই বা কই! কিন্তু আমার বাড়ীর লোকেরা আবার শুনলে—আচ্ছা দেখি—

যাওয়া ঠিক হল বটে কিন্তু মানুর মা'র চোখে এল জল। আড়ালে ডেকে নিয়ে সুলতাকে সে বলল, ছোটলোক বলে আশীর্বাদ আমার ছোট নয় বৌমা! আর দেখা হবে কি না হবে। ও-জন্মে মেয়ে হয়েই এসো মা, কিন্তু মাথাটা এনো পুরুষ মানুষের। ঝি হয়ে

এবার তোমাকে রাখতে পারলাম না, এবার যেন কোলের ঝি ক'রে পাই! বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার আশীর্বাদ আর করব না, শুধু বলি, তোমার চোখের জল যেন আর না পড়ে মা।

॥ ৬ ॥

দু'ধারে সুদূর অবারিত ফাঁকা মাঠ, তার কোলে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রাম বললে গুটিকয়েক গাছের জটলা, খানকয়েক পাতার চাল ছাওয়া কুঁড়ে ঘর, আঁকাবাঁকা গুটি দুই তিন পায়ে চলা পথ, এক আধটি আশপাশের জলাশয়, কচিৎ ছোট ছোট ধানের গোলা, শীর্ণকায় কয়েকটা গৃহপালিত পশু।

মাঝামাঝি উঁচু বাঁধানো পথে ট্রেনের লাইন চলে গেছে।

ছোট গ্রামের ছোট ইষ্টিশান—।

গাড়ী এসে থামতেই একটুখানি সোরগোল শোনা যায়, দু-একটি লোক নামা-উঠা করে, ঘণ্টার টুং টুং আওয়াজ কানে আসে, একটি বাঁশী বাজে, তারপর ধূম উদ্গীরণ ক'রে আবার গাড়ী ছাড়ে। সমস্ত দিনে একখানি গাড়ী যায়, একখানি আসে, বাকী সব সময়টাই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নিঝুম! গভীর রাতে নাকি ডাক-গাড়ী ছুটে যায় এই পথে।

দুজনকে নামিয়ে দিয়ে একটু আগে গাড়ীখানা চলে গেছে।

মাথার ওপরে ঠিক-দুপুরের রোদ চন্‌চন্ করছে, বোধ করি বৈশাখের শেষ। আকাশ একেবারে মরুভূমির মত রুক্ষ, রিক্ত, ছায়ালেশহীন। কোথাও একবিন্দু মেঘের চিহ্ন নেই। গাছপালা-গুলি চারিদিকের এই অগ্নিকাণ্ডে আত্মসমর্পণ ক'রে ক্ষণে ক্ষণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে ধুলো উড়িয়ে শুকনো উপবাসী হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল।

খর-রৌদ্রের আওতায় সুলতার পথশ্রান্ত মুখখানি হয়ে উঠেছে

সিঁদুরের মত রাঙা। খোলা প্রকৃতির একটি স্নিগ্ধ ছায়া তার চোখ দুটিতে নেমে এসেছে। দূর প্রান্তর এবং অরণ্যরেখার সঙ্গে তার অন্তরের একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল।

কুলির মাথায় বাক্সটি তুলে দিয়ে উপেন বলল—আর দাঁড়িয়ে থাকে না, আসুন—রোদে মাটি ফাটছে। ঘামে একেবারে আপনি নেয়ে উঠেছেন!

প্ল্যাটফরম্ পার হয়ে টিকিট-ঘরের সুমুখ দিয়ে দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার গাড়ী এদিকে নেই, জনকয়েক স্থানীয় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এসে ঘিরে ধরল—'কুথা যাবেন? কুন্ গাঁ?

উপেন বলল—নন্দীপুর।

—লন্দিপুর? আসুন তবে আমার গাড়ীতে। ছাড় টাকা দিবেন। আমার গাড়ী লন্দিপুরের। লতুন বিচেলী-পাতা গাড়ী বাবু—আসুন।

লোকটি ছুটতে ছুটতে গিয়ে বলদ দুটোকে গাড়ীতে জুত্‌তে লাগল। দুজনে এল তার পিছু পিছু। গাড়ী তৈরী হলে বাক্সটা ভেতরে দিয়ে উপেন কুলি বিদায় ক'রে দিল। রোদের উত্তাপে দাঁড়াবার সাধ্য ছিল না। উপেন বলল—আর দেরি করবেন না, উঠুন—ওঠাও ত মুশকিল দেখছি, সকলের সুমুখে মেয়েছেলের পক্ষে উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা করাটা একটু বিপজ্জনক। গায়ের উড়ুনিটা খুলে আড়াল করব নাকি?—ওহে, কী তোমরা দেখছ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে? যেন গিলছে! রূপ কি কখনো দেখনি?

অনেক চেষ্টা ক'রে উঠে সুলতা ভিতরে গিয়ে বসল। উপেনও উঠল, উঠে তার পাশে গিয়ে কোনোমতে জায়গা ক'রে নিল।

পথ অনেক দূর—!

ফাঁকা মাঠের মধ্যে ধুলো উড়িয়ে, খানা-খোপে চাকা বসিয়ে উঁচু-নীচু অসমতল জমির ওপর হেলে দুলে মন্থর গতিতে গরুর গাড়ী চলেছে। এ চলার মধ্যে একটি নিরুদ্বেগ অবকাশ আছে, দিবা-

স্বপ্নের একটি ক্লান্ত সুর আছে, আবেশ বিহ্বলতার একটি ছন্দ আছে। এ পথ ফুরোবার আশায় বসে থাকার একটি আরাম পাওয়া যায়, শেষ হয়েও শেষ হবে না, একঘেয়ে সুরের মত চলেছে ত চলেছেই! গরুর গাড়ীতে চড়লে যাত্রীর চোখে তাই তন্দ্রা আসে। এর গতি আছে কিন্তু বেগ নেই। মন উন্মুখ হয়ে থাকলে এ গতির মধ্যে একটি উদাস করুণ সঙ্গীত আবিষ্কার করা যেতে পারে।

দরমা আর বাঁখারি দিয়ে ঘেরা ছই। পুরু খড়ের বিছানার উপর দুজনে অনেকক্ষণ থেকে নিঃশব্দে বসে ছিল। গাড়ীর ঝাঁকানিতে মাঝে মাঝে গায়ে গা ঠেকেছে!

উপেন বলল—জায়গা থাকলে সরে গিয়ে বসতাম, গায়ে গা ঠেকে যাওয়া আমি মোটেই পছন্দ করিনে।

সুলতা বলল—কি করবেন বলুন!

—না, তাই বলছি, স্বভাবটা আমার ভারি বেয়াড়া। মানুষকে খানিকক্ষণ ভাল লাগে, সমস্তক্ষণ কাছে থাকলে আমি হাঁপিয়ে উঠি। নিতান্ত স্বার্থপর লোক আমি।

সুলতা চুপ ক'রে রইল। পথ আর ফুরোয় না!

—দেখুন, একটা কথা না বলে আর থাকা গেল না। দিদির কাছে কি বলে আমার পরিচয় দেবেন? আমার সঙ্গে তো আর আলাপ নেই তাঁর?

—কি বলব বলুন ত?

—তাই ভাবছি। বাঙালী সমাজ স্বামীর বন্ধুকে নিয়ে বিদেশ যাত্রার কথাটা না সইতেও পারে। আমাদের দেশের মেয়েকে আমরাই সব চেয়ে অশ্রদ্ধা করি এবং সন্দেহ করি, তা জানেন ত?

সুলতা বলল—দিদি সে রকম লোক নন্।

তা জানি, শুধু ভয় করছি দিদির দেশটাকে। সাহসটাও ত নেহাত আপনার কম নয়, অল্পবয়সী বিধবা হয়ে স্বামীর বন্ধুকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন! আপনি ভাল মানুষ বলে লোকে ত আ

ভাল চোখে দেখবে না! মানুর মা আমাদের এত চোখে চোখে রেখে শেষে কিনা এই সহজ কথাটা বেমালুম ভুলে মেরে দিল! মেয়েরা এমনিই—'বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো!'

সুলতা বলল—তাহলে কি বলব?

—তাইত, কিই-বা বলবেন! দেশের লোক পৌঁছে দিতে এসেছে —মেদিনীপুরের মেয়ে হলে আপনি একথা বলতে পারতেন, লোকে মুখ টিপে হাসত, আর কিছু জিজ্ঞেস করত না।

উপেন চিন্তিত মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

একখানি ছোট গ্রামের কিনারা দিয়ে গাড়ী চলছিল। একধারে তালগাছ ছাওয়া রাস্তা, দূরে সমতল ভূমিটা উঁচু হয়ে আবার নীচের দিকে গড়িয়ে গেছে। বাঁ-দিকে মাঠের পথে একটা চাষা হুঁকো হাতে ক'রে দুটো বলদকে তাড়িয়ে আনছে। শালিকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

—এ গাঁয়ের নাম কি গা?

—সরস্বতী!

—সরস্বতী? ও, তাই লক্ষ্মী-শ্রী নেই! বলি আর কতদূর হে?

—আর তিন ক্রোশ বাবু!

গ্রাম পার হয়ে আবার মাঠে পড়ল। খোলা মাঠের হাওয়া ছইয়ের মধ্যে আগুনের হল্‌কার মত এক-একবার ঘুরে যাচ্ছিল।

উপেন বলল—মাঝখানে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, আপনার দিদি শুনে যে কি করবেন তাই ভাবছি।

সুলতা বলল—কাঁদবেন খুব।

—সে ত বুঝতেই পাচ্ছি। আপনার মুখে যতটা শুনেছি, মনে হচ্ছে তিনি আপনাদের কাছে অনেক আশা করেছিলেন। আশা মানুষকে অনেক দূরে নিয়ে যায় কিনা!

কপালের নীচে চুলের গোছাগুলি সুলতার হাওয়ায় দুলছে! ঘামের ফোঁটাগুলি মুখের উপর শুকিয়ে রয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা

যাচ্ছিল। মুখে চোখে তার একটি সকরুণ মৌনতা ছবির মত ফুটে স্থির হয়ে রয়েছে। মনে হল এতদিনের এত ঝড়-ঝাপটা, এত গ্লানি, এত দারিদ্র—তার কোনো দাগই এ মেয়েটির মুখের মধ্যে নেই। দুর্নীতির বোঝা, কলঙ্কের কালিমা, এ মেয়েটির শুভ্র নিষ্কলুষ মুখখানিকে এতটুকু মলিন করতে পারেনি।

উপেন বলল—ভয় হচ্ছে না আপনার?

সুলতা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। উদাসীন দুটি চক্ষু তার তন্দ্রায় ভারি হয়ে এসেছে।

উপেন বলল—এই ধরুন লোকালয় ত নেই এদিকে···একলা চলেছেন আমার সঙ্গে, এত কাছাকাছি বসে রয়েছেন···ধরুন ওই গাড়োয়ানটাও কিছু জানে না আমাদের সম্বন্ধে,—আর তা ছাড়া আমাকে আপনার লোক বলবেন আপনি কোন্ হিসাবে। সাধারণ মানুষ বলেও ত নিজের ওপর আমার একটা অবিশ্বাস আছে।

সুলতা প্রতিবাদ করল না।

—দেখুন, আপনি উত্তর দিন্—যা হোক্ একটা কিছু উত্তর দিন, আপনি চুপ ক'রে থাকলে আমার গায়ের গেরোগুলো আল্‌গা হয়ে এখুনি কাঁপুনি ধরবে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুলতা অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একবার মুখ ফিরিয়ে শুধু বলল—আজ সারাদিন আপনার কিছু খাওয়াই হল না।

কি কথার কি উত্তর! বাঁধা তারগুলি পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে গেল! উপেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল—দেখুন, এই আত্মীয়তাগুলোকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, বিশেষ ক'রে আপনার মুখ থেকে। মানুষকে তোষামোদ করবার, খুশী করবার, অতিরিক্ত আত্মীয় ভাববার ইচ্ছাটা আপনার মজ্জায় মজ্জায় জড়িয়ে আছে।

সুলতা দুঃখিত হল, ধীরে ধীরে যেন মরমে মরে যেতে লাগিল।

উপেন বলল—মাটির পুতুল আমরা সবাই কিন্তু আপনাকে মনে হয় কাঁচা মাটি। ছাঁচ্ বদল করলেই আপনার চেহারা বদ্‌লায়।

অপরাধিনীর মত সুলতা মাথা নীচু ক'রে রইল।

—দিদিকে কাছে পেয়ে আমার সম্বন্ধে যে আপনি উদাসীন হবেন, সে ত এখন থেকেই বুঝতে পাচ্ছি।

সুলতা এবার কথা বলল—আমাকে আপনি ভুল বুঝছেন।

মুখের একটা শব্দ ক'রে উপেন বলল—ভুল বুঝলেই হয়ত ভাল হ'ত! একটা কিছু অবলম্বন পাওয়াই হচ্ছে আপনার জীবনের চরম সার্থকতা!

বেলা পড়ে এসেছে। নন্দীপুরের পথ আর বাকি ছিল না। দূরে একটা তালের জঙ্গলের পাশে সূর্য হেলে পড়েছে। কাছাকাছি কোন্ গ্রামের কয়েকটা ছেলেমেয়ে কোলাহল করতে করতে এই দিক দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। মাঠের পূর্ব পারে শালবনে একটু একটু অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

একবার মুখ বাড়িয়ে চারিদিকটা দেখে নিয়ে উপেন কবির ঢঙে বলল—সূর্যদেবের রাগ পড়ে এসেছে, অনুরাগের রঙে একটু একটু ক'রে রাঙা হয়ে উঠছে আকাশটা। সন্ধ্যের আগে পৌঁছনো যায়!

কথাটা গাড়োয়ানের কানে গেল। বলল—আর দেরি নাই বাবু।

—দেরি ত নেই! সুলতার দিকে তাকিয়ে উপেন বলল—কিন্তু এ-পথ আমাদের পথ ভুলিয়ে কোন্ দিকে যে নিয়ে যাচ্ছে [illegible] ত বুঝতেই পাচ্ছিনে।—এ আবার কি হে গাড়োয়ান, পাতাল-পুরীতে নেমে যাচ্ছি যে!

একটি ছোট নদী শুকিয়ে গেছে। দুই তটের মাঝখানে বালির রেখা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তারই ওপর অস্তমান সূর্যের আভা পড়ে সমস্তটাই রাঙা হয়েছে। প্রান্তরের মাথায় আকাশে সন্ধ্যাতারাটি জ্বল জ্বল করছিল। গরুর গাড়ী গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এল সেই নদীর ওপর।

নদী পার হয়ে, কয়েকটি সুপারি গাছের সারির পাশ কাটিয়ে, গাঁয়ের মধ্যে গাড়ী ঢুকল। একটু একটু মানুষের সাড়া-শব্দ পাওয়া

গেল! কোনো কুটীরের দীপশিখা সবেমাত্র জ্বলে উঠেছে। বাঁ-পাশে ছোট একটা ইস্কুল-ঘর ফেলে রেখে গাড়ীখানা ধীরে ধীরে একটা অর্ধশুষ্ক পুষ্করিণীর ধার দিয়ে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

--নামুন বাবু লক্ষ্মীপুর!

—তাই নাকি? বেশ এবার ভৃঙ্গী এই ... ।

নিজে গাড়ী থেকে নেমে উপেন সু...

ইতিমধ্যেই ছেলে-বুড়ো গাঁয়ের কয়েকটা স্ত্রী ... ক-বালিকা ভিড় ক'রে তাদের পিছু পিছু এসেছিল। এই অপরূপ দুটি নরনারীকে এমন অনভ্যস্ত অপরিচিত গ্রামের পথে দেখে তাদের মুখে আর কথাই ফুটছিল না।

—চৌধুরী বাড়ীটা কোন্ দিকে কেউ বলতে পারেন?

একজন প্রৌঢ় লোক এগিয়ে এল। সাহস ক'রে বলল—উই যে, যান—ওই হোথা! নয় ত আসুন আমার সঙ্গে—দেখিয়ে দিই।

লোকটার উৎসাহ দেখে উপেন একটু হাসল। চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে চুপি চুপি বলল—সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে।

সুলতাও হাসল। বলল—মুখে আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না।

খানিকটা আঁকা-বাঁকা পথ পার হয়ে এসে লোকটি বলল—বাড়ীর চাবি সঙ্গে এনেছেন ত?

উপেন বলল—তার মানে? বাড়ী কি তালা দেওয়া নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানেন নি বুঝি? কেউ ত নাই সেখানে?

—দিদি নেই? দিদিকে চেনেন না আপনারা?

—চিনিনি আবার? তিনি সকলেরই দিদি। গাঁয়ের লোক তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে জল খায় না। দিদির স্বামী একবার সন্নিসি হয়ে চলে যান সেবার—

উপেন বলল—কোথায় তিনি?

—তিনি পরশু দিন চলে গেছেন, এখান থেকে। হঠাৎ তীর্থে যাবার সঙ্গী জুটে গেল কি না—

অপর্ণতার বুকের ভেতরটা গুরগুর্ ক'রে উঠল। কম্পিতকণ্ঠে বলল—এতদূর আসা মিথ্যে হল ?

ভয়ে এবং নিরুৎসাহে উপেনের গলাটাও শুকিয়ে উঠল। জড়িত-কণ্ঠে শুধু সুলতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—এই বিদেশে এ অবস্থায় আপনাকে নিয়ে এখন কি করি ? কোথায় যাই ?—আজ ত ফিরে যাবার গাড়ীও নেই !

—ফিরে ? বড় বড় দুটি চোখ তুলে সুলতা বলল—আবার সেই বাড়ীতে ? উঁহু—না, আর সেখানে না !

গলার আওয়াজে উপেন চমকে উঠল। পরনির্ভরশীলা সহায়হীনা এই মেয়েটির রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল। বলল—অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া মানুষের আর কোনো পথ নেই এ-কথা আজ আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করলাম।

লোকটি একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। এবার কাছে এসে বলল—আপনাদের ফিরে যেতে হবে দেখছি। যদি অনুমতি করেন ত বলি—

—কি, বলুন ?

—গরমের ছুটিতে ছেলেদের ইস্কুল ঘর বন্ধ আছে ; আজ সেখানে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। আমি সেখানকার মাষ্টার।

মরা দেহে প্রাণ ফিরে এল। সুলতা বলল—তাই চলুন না।

—বেশ! আবার দুজনে লোকটির পিছু পিছু চলতে লাগল। বাক্সটা কাঁধে নিয়ে গাড়োয়ানটা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছিল।

আবার সেই আঁকা-বাঁকা পথ, সেই পুকুর-পাড়, সেই ছোট টিবটিপে মুদীর দোকান, মাটির পাঁচিল-ঘেরা সেই তাড়িখানার অস্ফুট কোলাহল—সমস্তটা আবার পার হয়ে এসে ইস্কুল-ঘরটা দেখা গেল। ছেলে-মেয়েরা হাঁ ক'রে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল, আশপাশে গৃহস্থের মেয়েদের জটলা সুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারেও নারীর এই আশ্চর্য রূপের দিকে তাকিয়ে বারোয়ারি তলায় বসে বিধু ভট্টাচায্যি

হুঁকো টান্‌তে ভুলে গেলেন। নিতাইচাঁদ পথের ...কে দাঁড়িয়েছিল,—এই মাসেই তার বিবাহ হবার কথা—সু...ার করল! তাকিয়ে নিজ বিবাহের প্রতি তার মনটা নিদারুণ বিতৃষ্ণা...ব না: উঠল।

ইস্কুল-ঘরের রোয়াকের ওপর উঠে গাড়োয়ান বাক্সটা নামিয়ে দিয়ে আপনার প্রাপ্য চুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে!

পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে একটা কাঠি জ্বেলে উপেন বলল—অন্ধকার যে! সাপ-খোপ নেই ত? জন্তু-জানোয়ার! একে পুরোনো, তায় আবার এঁদোপড়া! ও মাষ্টার মশাই, কি হবে?

ঘরখানির চাবি খুলে দিয়ে লোকটি বলল—আজ্ঞে না, কোনো ভয় নেই! দাঁড়ান্ আমি আলো আন্‌ছি।

—শুধু আলো নয়, সারাদিনই আজ হরি-মটর চল্‌ছে—ওদিকটার ব্যবস্থাও করবেন তাহ'লে। এমন পরমা সুন্দরী অতিথি পেলে আমিও এতক্ষণে মচ্ছব লাগিয়ে দিতাম!

—আজ্ঞে, সে কথা কি আর বলতে হবে? এতটুকু দেরি হবে না, সকল ব্যবস্থাই ক'রে দিচ্ছি, এত আমার সৌভাগ্যি!—আর হ্যাঁ,—লোকটি কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—গরমের দিনে বিছানায় ত আর শুতে পারবেন না—একেই গাড়ী থেকে নেমেছেন,—একটা মাদুর আর দুটো বালিশ আপনাদের জন্যে আনিয়ে দিচ্ছি!

উৎসাহে আনন্দে লোকটি আবার ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

এতক্ষণ যে-কথাটা মনে হয়নি, এবার সেটা ভয়ানক চেহারা নিয়ে দুজনের কাছে দেখা দিল। একটিমাত্র ঘর, কিন্তু তারা যে একা! উপেনের মনে হল, আজকের এই নিভৃত রাত্রি অতিক্রম করার মত কঠিন কাজ সংসারে আর কিছু নেই!

অন্ধকারে দুটি নরনারী তখন পরস্পরের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে!

## ॥ ৭ ॥

আলো হাতে ক'রে মাষ্টার মশাই আবার যখন ফিরে এলেন, তখন ঘুটঘুট্টি রাত।

উপেন তখনও তেমনি ক'রে হাতের ওপর মাথা রেখে বসেছিল, আর স্থলতা ছিল পাশেই অন্ধকারে নিঃশব্দে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

রোয়াকের ওপর আলোটা রেখে পিছন দিকে তাকিয়ে মাষ্টার মশাই বললেন—নে, নামা—নামিয়ে রেখে চলে যা, আমিও যাচ্ছি!

একটি বামুনের ছেলে দুখানি খাবারের থালা নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে আবার চলে গেল।

—উঠুন আপনারা, এই জল এনেছি বালতি ক'রে—মুখ-হাত ধুয়ে বসে পড়ুন।

উপেন একটুখানি হাসল। বলল—আলোটা আর-একটু আগে আনলেই ভাল করতেন মাষ্টার মশাই, নিজের মুখের চেহারাটা একবার ভাল ক'রে দেখে নিতাম!

হেঁয়ালীটা সম্যক্ উপলব্ধি না ক'রে মাষ্টার মশাই তার মুখের প্রতি তাকিয়ে রইলেন।

উপেন আবার হাসল। হেসে বলল—আপনি যা ভেবেছেন অর্থাৎ ওই যে একটি মাদুর আর দুটি বালিশ এনেছেন বগলে ক'রে,—স্থলতার দিকে একবার তাকিয়ে সে পুনরায় বলল—আমরা তা নই, বুঝলেন না?—যাক্, এখনো আপনি হাঁ ক'রে তাকিয়ে! আপনি হয় সরল, নয় ত খোকা। ক'বছর আপনি ছেলে চরাচ্ছেন মাষ্টার মশাই?

—আমার ওপর কি রাগ করলেন?

—রাগ? হাঃ হাঃ হাঃ—ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে আপনার নিজের ছেলেবয়েসও কটেনি দেখছি। রাগ করব কেন? বরং মনে মনে আপনার উপকারের একটি মূল্য দেবার চেষ্টা করছি

মাষ্টার মশাই চুপ ক'রে রইলেন।

অনেকগুলি টাকা উপেন জামার পকেট থেকে বার করল। তারপর বলল—দান ক'রে আপনার এ উপকারের অপমান করব না ; এই পুরোনো ইস্কুল-ঘরটার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি, নিজের হাতে আপনি মেরামত করিয়ে নেবেন—নিন্ ধরুন !

মাষ্টার মশাই একবার সবিনয়ে বলবার চেষ্টা করলেন—বেশ ত, কাল সকালেই না হয়—

—না, আর সকালে নয়, এই ক'ঘণ্টার মধ্যে হয়ত ভানুমতীর খেল হয়ে যেতে পারে ! এখুনি আপনাকে এ টাকা নিতে হবে।—একটু হেসে আবার সে বলল—তাছাড়া সকালে আমার হাত থেকে এ টাকা নিতে আপনার প্রবৃত্তি নাও হতে পারে !—নিন্, হাত পাতুন !

টাকাগুলি হাতে ক'রে নিয়ে মাষ্টার মশাই থতমত খেয়ে দাঁড়ালেন।

—যান্, আর এক মিনিটও দাঁড়াবেন না ! কৃতজ্ঞতা জানাবেন ? ধন্যবাদ বরং ওগুলো কাল সকালের জন্যে মুখস্থ ক'রে রেখে দেবেন।

মাষ্টার পিছন ফিরে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলেন। নির্বাক স্থলতার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে উপেন চট্ ক'রে বলল— শুনুন, একবার দাঁড়ান মাষ্টার মশাই—আচ্ছা, আপনার কন্যাদায় আছে ?

—আজ্ঞে না আমার মেয়ে নেই।

—নেই ? হতে কতক্ষণ ? আপনার অঙ্কশায়িনীর বয়স কত ?

মাষ্টার ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। উপেন আরো কতকগুলি টাকা পকেট থেকে বার ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে বলল—আগে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এবার ছুটতে ছুটতে যান্ ! নইলে খেয়ালী লোক আমি, বুঝলেন ত, দিয়ে আবার কেড়েও নিতে পারি।

মাষ্টার মশাই চলে যাবার পর উপেন এসে আবার বসল।

কোথায় শেয়ালের গলার আওয়াজ পেয়ে গ্রামের কোন্ প্রান্তে কুকুর ডাকাডাকি করছিল। সারাদিনের পর খোলা মাঠের হাওয়া একটু একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সুমুখে কয়েকটা গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সড়সড়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। শুকনো মাটির একটা রুক্ষ গন্ধে চারিদিকটা ভর ভর করছে। অনেকক্ষণ থেকে একটা ডাহুক কোথায় চীৎকার করছিল—এবার তার জর্জরিত কণ্ঠস্বর অনেকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে।'

খেতে বসে উপেন বলল—রাত বড় অন্ধকার, অমাবস্যা কি না কে জানে!—ওকি, বসে কেন? আরম্ভ ক'রে দিন্?

প্রদীপের আলোর দিকে তাকিয়ে সুলতা বসেই ছিল। বলল—আগে আপনার হোক, তারপর—

—মানে? এবার বুঝি আমার সুমুখে বসে এটা খান্, ওটা খান্ করবেন? না না, অধিকার যেখানে এতটুকু নেই সেখানে গোঁজামিল আমার ভাল লাগে না। হাতের কাছে পাখা থাকলে আপনি বোধ হয় বাতাস করতেও দ্বিধা করতেন না?

একটু থেমে উপেন আবার বলল—সুন্দরী মেয়ের কাছে যত্ন নেবার যে কাঙালপনা, সে জাতের ব্রহ্মচারী আমি নই; অভিজ্ঞতা আমার অনেক—আমাকে ভুল বুঝবেন না!

সুলতা কম্পিতকণ্ঠে বলল—আমি ত তা মনে করিনি উপেনবাবু!

—মনে আমি যে করি সুলতা দেবী। আমি যে কী আমার একেবারে মুখস্থ। বেশী বয়েস পর্যন্ত বিয়ে করিনি বলে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে কিছু ত্রুটি রেখেছি? কিন্তু তবুও বলি, সুন্দরী বন্ধু-স্ত্রী কিংবা রূপসী বৌদিদি প্রভৃতি রস-সম্পর্কীয়ার সেবা-যত্ন নিয়ে নিজের ভেতরের উপবাসী মানুষটিকে তৃপ্ত করা—এ কাপুরুষতাকে চিরকাল আমি ঘৃণা ক'রে এসেছি। বাঙালী মেয়ের মেরুদণ্ড ভয়ানক দুর্বল সুলতা দেবী, আমি তাদের এতটুকুও বিশ্বাস করিনে।

খেয়ে-দেয়ে উঠে যাবার আগে উপেন আবার বলল—[illegible]

সঙ্গে একটা ভয়ানক ঝগড়া করতে আজ প্রস্তুত ছিলাম, আপনাকে ওপর আজ ঘৃণা জাগারই প্রয়োজন ছিল।

সুলতা মুখ তুলে তাকাল।—কেন বলুন ত? কি করলাম?

—বুঝতে পারলেন না? ব'লে একটু হেসে উপেন ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভেতরে পায়চারি করতে করতে বলল—অত্যন্ত সহজে মানুষ যে বস্তুটি জয় করতে পারে আমার পক্ষে সেটা অতিরিক্ত কঠিন।—ভিজে এঁদোপড়া গন্ধ, স্যাঁতসেঁতে হাওয়া—আশ্চর্য, এই নোংরা আবহাওয়ায় ঢুকে আজ কতদিনের কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। একটুখানি বাতাস, গাছের পাতার সামান্য শব্দ—এই লক্ষণগুলো ধরে মানুষের মন কতদিনের কত স্মৃতির আনাচে-কানাচেই ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে বেড়ায়!—আপনাকে প্রথম দেখার দিনটি মনে পড়ে যাচ্ছে!

সুলতা কোনো উত্তর দিল না।

—সেদিন কি ভেবেছিলাম কে জানে! গায়ের শাল মাটিতে লুটিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে, কোঁচা দুলিয়ে, চলনের ভঙ্গীতে মধু ঢেলে দিয়ে হেসে চলে গিয়েছিলাম! আজকালকার ছেলেরা এই সামান্য কথাটি বোঝে না, পুরুষের ছলা-কলা মেয়েরা অত্যন্ত ঘৃণা করে। ছলা-কলা যে মেয়েদের নিজস্ব! নিজের জঘন্য প্রবৃত্তির কথা ভাবলে নিজেই মাঝে মাঝে শিউরে উঠি।

উপেন চুপ ক'রে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আলো হাতে নিয়ে সুলতা ঘরে এল। উপেন বলল—আপনি সরল মানুষ, আপনার সঙ্কোচ নেই, আমার কিন্তু দম আট্‌কে যাবে!—ব'লে সে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সুলতা বলল—আর একখানা ঘর থাকলেই ভাল হ'ত!

—মনে হয়েছে এতক্ষণে? আমি ভাবছিলাম আপনি বুঝি ভুলেই গেলেন! আর একখানা ঘরের জন্যে আজ এই রাতে দশ হাজার টাকার 'হ্যাণ্ডনোট্' পর্যন্ত আমি লিখে দিতে পারি। হায় রে, সামান্য অভাবের সূত্র ধরে মানুষ কত বড় সর্বনাশই ডেকে আনতে পারে।

উপেন এসে এক জায়গায় বসে পড়ল। আকাশের অগণন

নপ-নক্ষত্ররাজির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে কি ভাবতে লাগল কে জানে। আকন্দ ফুলের মৃদু ভীরু গন্ধ কোথা থেকে তার নাকে আসছিল। আজকের রাত্রি সত্যিই অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বনের চারিদিকে ঝিঁঝি পোকার অক্লান্ত একঘেয়ে সুর একটি মোহজাল রচনা ক'রে চলেছে সে মোহ মানুষের গভীরতর চেতনাকে বিহ্বল ক'রে তোলে।

মনে হল কতকগুলি হিংস্র বিষাক্ত স্যাপ উদ্যতফণায় তাকে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে! দশ দিকের এই সূচীভেদ্য অন্ধকার নিশ্চল স্তব্ধতায় একটি ভয়ানক উদ্বেগ নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে যেন তার প্রতি তাকিয়ে আছে। অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রম ক'রেও নিজেকে ঠাট্টা এবং বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দেবার শক্তি আর সে খুঁজে পাচ্ছিল না! ভয়ে আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। আজ যদি সে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানায় ত তার সে মিনতি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? আকাশ ছেড়ে তার ভগবান কি এখনও পালায় নি?

সুলতা কখন এসে নিঃশব্দে পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল—রাত জাগলে অসুখ করবে না আপনার?

উপেন মুখ তুলল। বলল—অসুখ যদি করে, আপনার সেবা আমি নেবো না—যান্!

সুলতা থতমত খেয়ে বলল—মাদুর পেতে দিয়েছি, তাই বলতে এসেছিলাম।—এই ব'লে সে আস্তে আস্তে ভেতরে এল! তন্দ্রায় তার চোখ জড়িয়ে এসেছিল।

শাদা চোখে চেয়ে থাকা এক রকম, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকা আর এক রকম। তন্দ্রার মধ্যে সত্য-মিথ্যায় জড়ানো যে-স্বপ্ন, যে-কল্পনা—তার একটি আবেশ আছে। উপেন ওই এক রকম ক'রে বসেই রইল। বসে সে কতক্ষণ ছিল কে জানে, গা ঝাড়া দিয়ে কোন্ এক সময় সে উঠে দাঁড়াল। উঠে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল —সুলতা তখন দেয়ালের গায়ে কাত হয়ে চোখ বুজে রয়েছে। চোখ দুটো টেনে টেনে উপেন তার প্রতি একবার তাকাল, এবং

তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ—তারপর কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে বলল—কে জাল ক'রে ছড়িয়ে শুন না গিয়ে ?

সুলতা আচম্‌কা জেগে উঠে সরে এল। মাদুরটা পাতাই ছিল, তার ওপর এসে বসল। উপেন বলল—কি করি বলুন দেখি ?

চোখের ঘুম সুলতার ছুটে গেল, সে মুখ তুলে তাকাল।

উপেন কাছে বসে পড়ে বলল—আচ্ছা, মনে হচ্ছে কি যে আমি মদ খেয়েছি? সত্যি বলছি, আমার গায়ের রক্তে কে যেন এক বোতল মদ মিশিয়ে দিয়েছে, মাথার মধ্যে পাগলের দল উগ্র নেশায় ক্ষেপে উঠছে। আচ্ছা, আমাকে রক্ষা করবার কোনো উপায় কি আপনার জানা নেই ?

সুলতা বলল—কি বলছেন আপনি ?

কণ্ঠ বোধ করি উপেনের রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। বলল—কি বলছি ? —ব'লে একটা ঢোক গিলে সে পুনরায় বলল—বলছি যে ঘুমে আপনার চোখ ঢুলে এসেছে, আপনি শুয়ে পড়ুন,—আমি যাই বাইরে গিয়ে একপাশে পড়ে থাকি, তারপর সকাল হলে—

সুলতা বলল—পোকা-মাকড় যদি কিছু কামড়ায়, তা ছাড়া শেয়াল-কুকুর—

উপেন একটু হাসল। হেসে বলল—পোকা-মাকড় কামড়াচ্ছে বলেই ত বাইরে যেতে চাইছি।

সুলতা বলল—ভেতরে শুলে কি আপনার ঘুম হবে না ?

—না, কিছুতেই না। ভেতরে না, বাইরে না—মাঠে ঘাটে কোথাও গিয়ে আজ আমার ঘুম হবে না ? সবাই মিলে আজ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আমার সুখ নিয়েছে, শান্তি নিয়েছে,—আজ কোথাও আমার পালাবার পথ থাকলে আপনাকে একা এখানে ফেলে চলে যেতাম। পাগলের উন্মত্ত প্রলাপের মত উপেন বলে চলল—এই রাত, এই বনজঙ্গল, এই দিশেহারা পথ, ঝিঁঝির ডাক, গাছের শব্দ, কুকুরের কান্না—সমস্তগুলো মিলেমিশে আজ আমাকে পুড়িয়ে মারতে

অপচেষ্টা করছে,—আমি বন্দী,—মুক্তির নিশ্বাস নেবার স্থান আর কোথাও রইল না।

ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে সুলতা বলল—আপনি আশ্চর্য!

—মিথ্যে কথা। বিস্ময়ের কিছু নেই আমার মধ্যে। নিতান্ত—নিতান্ত সাধারণ মানুষ আমি। সামান্য একটা রাতের জন্যেও নিজের ভেতরকার জন্তু-জানোয়ারগুলোকে বশে রাখতে পাচ্ছিনে আপনাকে সঙ্গে আনার দায়িত্ব, আপনাকে সাহায্য করবার কথাটা একদম ভুলতে বসলাম?—ওকি, না—অমন ক'রে আমার দিকে চাইবেন না। নিজেকে অপমান ক'রে এসেছি চিরকাল, কিন্তু ঘৃণা যেন আর না করতে হয়। অমন ক'রে মুখের দিকে তাকালে আমি সব ভুলে যাব!

উপেন উঠে বাইরে চলে গেল। ঘোর অমা নিশীথিনী একটি ভয়াবহ রূপ নিয়ে তার কাছে আজ দেখা দিল। দেহ তার উত্তেজনায় একেবারে অবশ হয়ে এসেছিল, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে রোয়াকের ধারে মাথা কাত ক'রে সে বসে রইল। অসংযত নিঃশ্বাসের বেগে তার চওড়া বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল।

ঘুম কিন্তু তার চোখে আর এল না। অনেকক্ষণ স্তিমিত দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে সে আবার উঠে দাঁড়াল। তাকে যেন ভূতে পেয়েছে!

আবার এসে ঘরে ঢুকল। সুলতা তখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিদ্রিত নারীর দেহের দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর এদিক ওদিক একবার ঘুরে একটি ভাঙা শ্লেটের টুক্‌রো কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে সুলতার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে ডাকল—শুনচ? ওঠো সুলতা, লক্ষ্মীটি—শুনচ?

সুলতা চোখ খুলে তাকাল। তার নিদ্রাজড়িত বিস্মিত দৃষ্টি দেখে মনে হল, সে যেন তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থাই ভুলে গেছে। চুপি চুপি অস্ফুট কণ্ঠে বলল—আপনি? কেন? কি বলছেন?

কম্পিত কণ্ঠে উপেন বলল—তুমি ঘুমিও না, সমস্ত দেহটাকে ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হয়ে অমন ক'রে ঘুমিও না সুলতা! ভূমিকম্পে সমস্ত এখনি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে—তারপর চুপি চুপি বলল—জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কাছাকাছি বোধ হয় সমুদ্র আছে, ঢেউ আছড়াচ্ছে! শুনচ না?

—ঢেউ? সত্যি?—ভয়ে সুলতা আর উঠতেই পারল না!

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে উপেন বলল—বোধ হয় বান আসছে, সব এবার হয়ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে! কি হবে সুলতা?

সুলতা এবার উঠে বসল।

উপেন পুনরায় বলল—ধর্মের আলো গেল চোখ থেকে মুছে, নীতির বাঁধন গেল, সংস্কারের বেড়া গেল ভেঙে! ইহকাল-পরকাল কিছুই আর রইল না সুলতা। কিন্তু তুমিই বল, এতগুলো বস্তুকে ধ্বংস করবার শক্তি যার আছে সেটা কি কিছুই নয়? মানুষের জীবনে তার কি কোনো মূল্যই নেই?

—কী সে উপেনবাবু?

—কি? সে প্রেম নয়, আকর্ষণ নয়, স্নেহ-মমতা নয়—সুলতা সে যে কী এ আমি আজ আর বোঝাতে পারব না। সে আনে ঝঞ্ঝা, সমস্ত ওলোটপালোট ক'রে দেয়! প্লাবন আনে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বলে। পাপের মনোহর মূর্তি আনে, মুগ্ধ ক'রে দেয়! প্রলোভন আনে তাকে রাজবেশ পরিয়ে!—বলতে বলতে সুলতার একখানি হাত চেপে ধরে উপেন পুনরায় বলল—যে বস্তু সমস্ত ভুলিয়ে দেয় তাকে তুচ্ছ করব আমরা কোন্ স্পর্ধায়? সুলতা সেটা কি এতবড় মিথ্যে?

এই কথা একদিন সত্যেনও শুনিয়েছিল। হঠাৎ সুলতার মনে হল তার মৃত স্বামীর ছায়া উপেনের আবেগ-উচ্ছ্বসিত, উজ্জ্বল মুখখানার ওপর এসে পড়েছে! সুলতা হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল!

উপেন হাত সরিয়ে নিল। তারপর নিঃশব্দে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। পরে ধীরে ধীরে বলল—এমন যে কেন হয়

বুঝতে পারিনি। অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক অপমান, অনেকের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছি—কি পেলাম তাতে? আনন্দ? ছাই! এই একটি মাত্র দুর্বলতা, এ জন্যে বন্ধু-সমাজে আমার অপবাদের আর অন্ত নেই!

সুলতা বলল—তারা আপনাকে বুঝতে পারে না!

—পারে না? তা হবে। আমার যথার্থ যেটুকু সদ্‌গুণ, যেটুকু উদারতা, মহত্ত্ব, তা তাদের চোখে পড়ে না, আমার আনন্দ-বেদনাকে পর্যন্ত তারা এই লালসার নিক্তিতে ওজন ক'রে দেখে। সুলতা, বিধাতা বলে কেউ থাকলে বলতাম, মানুষকে এই পাশব প্রবৃত্তি দিয়ে তুমি স্বার্থপরতাই প্রচার করেছ! মানুষ পাছে স্বর্গরাজ্য গোড়ে তোলে এজন্যে তোমার ঈর্ষার আর শেষ নেই!

অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে উপেন আবার বলল—সুলতা, তুমি এমনিই,—কেউ যদি তোমার কাছে আসে তুমি তার চোখে কাজল বুলিয়ে দাও, তাকে নেশা দাও, তার জীবনকে অকর্মণ্য ক'রে তোলো! তোমায় দেখলে লোকের বিকার আসে, পাগলামি আসে, খেয়াল আসে! তোমার সঙ্গে মিশলে গাছের রঙ্ হয় সবুজ, আকাশ হয় রাঙা, মাটি হয় নরম! তুমি কেবলই পথ ভোলাতে পারো সুলতা!

আলোটা টিপ্ টিপ্ ক'রে এতক্ষণ জ্বলছিল। হঠাৎ বাইরে মেঘের ডাক শোনা গেল।

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে উপেন বলল—কি ও?

বোধ হয় মেঘ করেছে!—সুলতা বলল।

মেঘ? হাওয়া উঠল নাকি?—ব'লে উপেন উঠে বাইরে এল। আকাশের একদিকটা তখন লাল হয়ে উঠেছে। দূরে কোন পাহাড়ের চূড়ায় যেন আগুন লেগেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গগনের সর্বপ্রান্ত উত্তাল মেঘের জটলায় ঘোরালো হয়ে এল। দেখতে দেখতে মাটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বড় বড় গাছগুলি মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ছটপট্ ক'রে উঠল। বিদ্যুতের প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অন্ধকার রাত্রি ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল।

ধুলো-বালি পাতা লতা চারিদিকে উড়িয়ে আর্তনাদ করতে করতে বাতাস বয়ে চলল।

জান্‌লা দরজার ভাঙা পাল্লাগুলো ঝপাৎ ঝপাৎ ক'রে সশব্দে বুক চাপড়াতে সুরু করল। দূরে কোথায় একটা বাজ পড়ার শব্দ হল।

উপেন বাইরে থেকে ঘুরে আবার এসে দাঁড়াল। ঝড়ের দেবতার উদ্দাম জটাজালের দিকে তাকিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত সুলতা অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—পুরোনো বাড়ী, যদি সইতে না পারে সুলতা?

—চুপ করুন,—সুলতার গলা কেঁপে উঠল—ও কথা বলবেন না, আমি কি এখানে একলা আছি উপেনবাবু?

অসংখ্য রোগী-মুমূর্ষুর আর্তনাদের মত ঝড়ের গোঙানি কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ দেয়াল থেকে একটা বালির চাপড়া মাটিতে খসে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে উপেন সেই দিকে একবার তাকাল। তারপর এগিয়ে এসে সুলতার একখানি হাত ধরে বলল—আমিও একা নেই, এসো।

দরজার বাইরে এসে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার দিকে ক্ষণেকের জন্যে একবার তাকিয়ে সুলতা আরেকটি হাত দিয়ে উপেনের অন্য হাতখানা চেপে ধরে বলল—কোথা যাবেন এ দুর্যোগে? যদি বিপদ ঘটে আপনার?

উপেন বলল—আর যদি ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ে? তোমার জীবনের দায়িত্ব নিয়েছি এ-কথা ভুলব কেমন ক'রে সুলতা?

ঝড়ের গর্জনের নীচে তারা দুজনে পথে নামল। কিন্তু কোথা পথ, কোন্ দিকেই বা আলো? গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রাশি রাশি ধুলো উড়ছে, চোখ খুলে স্পষ্ট ক'রে তাকাবার উপায় নেই! বাতাসের বেগে তারা মাঝে মাঝে টলে পড়তে লাগল, আবার টাল সামলে এগিয়ে চলল। দুজনে দুজনকে শক্ত ক'রে ধরে পথ হাতড়াচ্ছে, ধুলোবালির জন্য চোখ বন্ধ করা ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না।

কয়েক পা এসে তারা একটা গাছের কাছে দাড়াল, গাছটা ।কন্ত তখন হাত পা ছুঁড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। ভেঙে মাথায় পড়বার আশঙ্কায় উপেন আবার সুলতার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

এক এক পা ক'রে তারা অতি সাবধানে চলছে। নাকে, মুখে, জামা-কাপড়ের মধ্যে তাদের কাঁকর বিঁধছে। মহাকালের মালা থেকে আজকের অস্বাভাবিক রাত্রিটি যেন খসে পড়েছে, এ রাত্রি তাদের পরমায়ুর মধ্যে গণ্য হবে না।

—কোন্ দিকে চলেছি বল ত সুলতা?

গভীরতম অন্তর থেকে অপূর্ব কোমল কণ্ঠে সুলতা বলল—তাত জানিনে? ফিরে যাই চলুন—

—ফিরে যাবেন ত এলেন কেন? এই বেশ লাগছে।

হঠাৎ বাতাসের একটা ধাক্কায় পায়ে পায়ে জড়িয়ে তারা ঘুরে পড়েছিল আর কি? আবার সোজা হয়ে তারা এগোতে লাগল। উপেন বলল—সুলতা, ভালবাসার সম্মান বুঝি কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্মান, একটি মেয়েকে যদি আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করা যায়? আমি খুব বড় দুশ্চরিত্র সুলতা, কিন্তু মেয়েদের মন আমি জানি, যুগে যুগে তারা বড় দুশ্চরিত্রকেই সম্মান দিয়ে এসেছে! আমি যেদিন তোমার চোখের সুমুখ থেকে সরে যাব, সেদিন আমার ছবিই তোমার আকাশ জুড়ে থাকবে!

তারা মাঠের ধারে এসে পড়েছিল। হাওয়ার বেগ থামেনি কিন্তু ধুলো-কাঁকর আর তাদের মুখে ফুটছে না। দুজনে চোখ খুলে তাকাল। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছিল না। উপেন বলল—এখানেই দাঁড়াই, রাত পুইয়ে যাক্।

সুলতা বলল—আগে ঝড় থাম্‌বে, কি আগে রাত পোয়াবে?

উপেন বলল—ঝড়ের রাতে ঝড়ই আগে থামে। চিরদিন ঝড়ের পরই রাত পোয়ায় সুলতা। এসো, এইখানে বসি একটু, হাওয়ার বেগে দাঁড়ানো যায় না,—মাথাটা ধরে গেছে!

সুলতা বসল তার পাশেই। তার কাঁধের ওপর একটি হাত

চেহারা তাদের বদ্‌লে গেছে। ধুলোয়, বালিতে ও ... জ
একত্রে মিশে দুজনের মুখেই কাদা মাখামাখি। ... চলুন এবা

দুজনেই হাসল।—একি চেহারা হয়েছে আমাদের? (
ঘরে যাই।

উপেন বলল—ওই ত ইস্কুল-ঘর, আমরা তা হলে অ
এইটুকু এসেছিলাম?—তা হলে কি করবে? কাশীতে তো
কাছেই যাবে?

—তা ছাড়া ত আর জায়গা নেই!

—তাই চল। একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে উপেন
কিন্তু আর নয় সুলতা, প্রলোভনের পাশে থেকে স
মহৎ ভণ্ডামী আমার নেই। কাশীতে তোমাকে পৌঁছে ...
চলে যাব।

দুজনে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই উপেন বলল—আ
দেরি নয়, চাদর দুখানা ঘরে পড়ে আছে, নিয়েই চলে এসো।

—সে কি, মাষ্টার মশাইকে না বলে—

—হ্যাঁ, তার আগেই পালাব। লোকজন জেগে উঠে শহুরে
মানুষকে ভিড় ক'রে দেখতে এলেই বিপদ। বিধবাকে নিয়ে একঘরে
রাত্রিবাস করেছি, তার ওপর এই চেহারা হয়েছে, যাবার সময় এ আর
গাঁয়ের লোককে দেখিয়ে কাজ নেই! তোমার মাথায় সিঁদুর নেই
মনে আছে ত?

সুলতা হেসে বলল—লুকিয়ে চলে গেলেই কি বুঝবে না?

—স্ত্রী বলে তোমায় জেনেছে, তাতে বিশেষ দোষ হবে না! স্ত্রীর
সঙ্গে জঘন্য কুৎসিত আচার ওরা সইবে, কিন্তু বিধবার সঙ্গে গীতা
অধ্যয়নও ওদের অসহ্য।

সুলতা গিয়ে চাদর দুখানি নিয়ে বেরিয়ে এল। ভোর হতে
তখন আর দেরি নেই।

সকালবেলা গাঁয়ের লোকেরা জেগে ওঠবার আগেই তারা অনেক
দূর পথ অতিক্রম ক'রে চলে গেল।

পশ্চিমের গাড়ীর কোনে একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরার একটি কোণে ছুটি ঘরছাড়া নরনারী এতক্ষণ নির্বাক হয়ে বসেছিল। সমস্তদিন অনাহারে এবং পথশ্রান্তির মধ্যেই কেটে গেছে। ছুজনেরই মাথার চুল এলোমেলো, রুক্ষ, তৈলহীন। পরনের কাপড়-চোপড়গুলি ময়লা, ধুলো মাখা,—গাড়ীতে কোথায় খোঁচ লেগে ছিঁড়েও গেছে। রোদের তাতে সমস্ত দিনটা গাড়ীর মধ্যে গরমে ভারি কষ্টেই কাটল।

ট্রেন চলছে। লোকজনের ভিড় বিশেষ নেই। জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে সুলতা বেঞ্চের ওপর পা গুটিয়ে বসেছিল, উপেন তারই একটা পায়ের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ থেকে অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে!

সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; ছুধারে মাঠ, বন-জঙ্গল, গ্রাম সমস্তই অন্ধকার! বাতাসের উষ্ণতা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি। মুখে চোখে এখনও গরমের আঁচ্ লাগে।

সুলতা ঘাড় ফিরিয়ে একবার ভিতরের দিকে তাকাল। উপেনের গলার গরদের চাদরটা এতক্ষণ মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল, সুলতা সেখানা তুলে গুটিয়ে নিজের কোলের মধ্যে রাখতেই নাড়াচাড়া পেয়ে উপেনের ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে উঠে বসে সে বলল—বৌদি?

সুলতা এবার ছেলেমানুষের মত না হেসে থাকতে পারল না। বলল—বৌদি? কত রকম ক'রে আমাকে ডাকবেন বলুন ত?

উপেন চোখ রগড়ে বলল—কাঠের ওপর মাথা রেখে চমৎকার যাতনার মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম, তোমার কোলের মধ্যে মাথা গেল কি ক'রে?

—ঘুমের ঘোরে তুলে নিয়েছিলাম!

তা জানি, ঘুমের ভান ক'রে নিজের মাথা কখনই তোমার কোলের ওপর তুলে দেব না! কিন্তু কেন শুনি? যত্ন, না মমতা?

সুলতা থতিয়ে গিয়ে বলল—অন্যায় হয়েছে?

উপেন এবার তার মুখের দিকে তাকাল; বলল—অন্যায়?

ব'লে সে হাসল। হেসে বলল—জীবনে অন্যায় তুমি এতটুকু করনি! কিন্তু যাক্ গে ওসব কথা; ঝড়ের মত্ততাকে আমি একদম ভুলেই গেছি বৌদি! এবার একটুখানি মধুর মিথ্যাচার ক'রে নিজেকে রসিয়ে নেবো। ইস্—তোমার যে অবস্থাটি হয়েছে সুলতা, তোমার দিকে তাকালে আমার মত প্রবীণ পুরুষের মুখও মেয়েদের মত লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। তোমাকে সাম্‌লে নিয়ে যাচ্ছি বলে কি তোমার পরনের কাপড়-চোপড়গুলোকেও সাম্‌লাতে হবে নাকি?

দুজনের মনই কেন জানি না, আজ সমস্তদিনই বেশ হালকা হয়ে রয়েছে। সুলতা হেসে বলল—আর আপনার ওগুলো বুঝি খুব চকচকে আছে?

দুটো হাত নেড়ে উপেন বলল—সুবিধে আছে, বুঝলে ভদ্র-মহিলা? আমরা যে পুরুষ, নিন্দে করবার কেউ নেই!

এমন কথাবার্তায় কিছুক্ষণ কাটবার পর উপেন বলল—দিদি কিন্তু না-থেকে আমাদের খুব ভোগালেন যা হোক! ভোর রাতে ইস্কুল-ঘর থেকে বেরিয়ে দুজনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাঠ পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে ইষ্টিশানে পালানো অনেকদিন মনে থাকবে! আচ্ছা, মাষ্টার মশাইয়ের মুখখানা মনে পড়ছে কি?

সুলতা বলল—মানুষটি ভারি শান্ত?

উপেন বলল—ওপরটা! পাড়াগাঁয়ের অভিজ্ঞতা আমার কিছু কিছু আছে! ওই মানুষ যখন সকালবেলায় উঠে দেখত যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই—তুমি বিধবা—তখনই ভোজবাজীর মত তাঁর মুখের চেহারা যেত বদলে! সামান্য অতিথি-সৎকারের জন্যে সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত!

সুলতা চুপ ক'রে রইল।

উপেন খানিকক্ষণ পরে বলল—এবার ত তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে! তোমার দিন সেখানে কাটবে কেমন ক'রে সুলতা?—থাক্, স উত্তরও আমি আর শুনতে চাইনে। আমি তোমায় ভালবাসলে যা-হয় এর উত্তর পাবার অধিকার আমার থাকত!

সুলতার চোখ দুটি ভারি হয়ে এসেছিল। মাথা নীচু ক'রে সে বলল—আপনি ত আমাকে ভালই বাসেন।

উপেন হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। বলল—রাতের বেলা গাড়ীর মধ্যে বসে স্পষ্টাক্ষরে তুমি একথা বলতে পারলে?

সুলতা বলল—একথা লুকিয়ে কি হবে?

—তা বটে! উপেন বলল—ভালবাসার পরিচয়ই বোধ হয় বরাবর আমি দিয়ে এসেছি! স্বামীর জীবিতাবস্থায় গোপনে স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করা, পরস্ত্রীর রূপের প্রশংসা, নিজেকে অর্থশালী ক'রে সুন্দর ক'রে মনোহর ক'রে দেখানো, নিঃস্বার্থ সাহায্যের আতিশয্য দেখিয়ে প্রবলভাবে আকর্ষণ করা, তারপর আমাদের কালকের ঘটনাটা—সুলতা, ভালবাসার এই পরিচয়ই বোধ হয় এখন দুনিয়াতে চলছে!

রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে দ্রুতগতিতে গাড়ী ছুটে চলেছে। মাঝপথে কোন্ ষ্টেশন থেকে গুটিকয়েক লোক ইতিমধ্যে গাড়ীতে উঠেছিল।

উপেন বলল—আশ্চর্য, নিজের চরিত্রের অলি-গলি সমস্ত জানি সুলতা, কিন্তু হৃদয়টাকে আজ অবধি খুঁজে পেলাম না! সে যে কোথায়, সে যে কি চেয়ে কি পায়নি, তা বুঝতেই পারলাম না! তার না-আছে কোনো ঠিক, না আছে কোনো ঠিকানা! সকলের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য থেকে সকলের চেয়ে বেশী বঞ্চিত রইলাম! বলতে পারো সুলতা, মানুষ কেমন ক'রে ভালবাসে?

সুলতা ধীরে ধীরে তার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে করুণকণ্ঠে বলল—আপনি অমন করবেন না উপেনবাবু, ও আমি সইতে পারি না।

আস্তে আস্তে উপেন হাতটা আবার টেনে নিল। তারপর

বলল—দুঃখ ? দুঃখ আমার নেই ! মুক্ত জীবন,—অবাধ ; মাথার ওপর কেউ কিছু বলবার নেই, যেখানে যখন ইচ্ছা যেতে পারি, খাওয়া পরার ভাবনা তিন পুরুষেও ভাবতে হবে না, মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করবারও যথেষ্ট সুবিধা আছে, অসচ্চরিত্র হয়ে জীবনটাকে একেবারে উড়িয়ে দিলেও কেউ বাধা দেবে না—কিন্তু সুলতা, ক্ষুধা কি তাইতেই মিটবে ? খাওয়া পরার দুঃখ না থাকা মানে কি কোনো দুঃখই নেই ?

সুলতা বলল—আপনি আরো একদিন বলেছিলেন একথা !

উপেন বলল—এই আমার কথা, আর কিছুই আমার নেই ! এই কথা নিয়েই আমার দিন যায়, রাত যায়,—এই কথা নিয়েই আমার পথে পথে কাটে ! কি আমার করবার আছে, কি আমি চাই, কি জন্যে এলাম—এই কথাই আমার সমস্ত জীবনকে অন্ধকার ক'রে রেখেছে সুলতা !

প্রায় সমস্ত রাত এমনি ক'রেই কেটে গেল। গাড়ী যখন ইষ্টিশানে এসে দাঁড়াল তখন চারটে বাজে !

কুলির মাথায় বাক্সটা দিয়ে দুজনে প্ল্যাটফর্মটা পার হয়ে এসে 'ওয়েটিং রুমে' ঢুকল। ভেতরে লোকজন কেউ ছিল না, যে জমাদারটা আড় হয়ে মেঝের ওপর পড়েছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেল।

দুজনে দুটো বেঞ্চি দখল ক'রে বসল। উপেন জল আনল। এনে বলল—মুখ ধোয়া যেতে পারে কিন্তু এখন খাবার-দাবার আর কিছুই পাওয়া যাবে না। বাড়ী পৌঁছেই যা হোক করা যাবে। মামার ওখানকার ঠিকানা মনে আছে ত ?

সুলতা বলল—আছে ! দেবনাথপুরায় ওঁদের বাড়ী।

মুখে চোখে জল দিয়ে বাক্স খুলে সুলতা দুজনের ফর্সা কাপড় বার করল।

উপেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বলল—স্বামী-স্ত্রী না হলে পথে অনেক বিপদ ঘটে দেখছি। কাপড় নিয়ে আপনি যান্ 'বাথরুমে'

আমি এখানেই কাপড় ছাড়ি। মেয়েদের পরিচ্ছদ বদলানোর মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে কি না!

সুলতা বলল—আপনার মুখের কোনো আগল নেই।—ব'লে সে চলে গেল।

কলের ঘর থেকে সে আবার যখন বেরিয়ে এল, তখন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তার একরাশ রূপ সমস্ত ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়ল।

উপেন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। নিষ্কলুষ স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলে উঠল—বৌদি, তোমার পায়ে ধরি, 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার!'—এ যে দেখছি আমারই দেওয়া সেই বসুন্ত্তি রঙের শাড়িখানি! বৈষ্ণবকবি কেউ এখানে থাকলে বলতেন, তোমার সর্বাঙ্গ জড়ায়ে শুধু আমিই আছি!

মনে হল সুলতার সকল মন সকল অঙ্গ একটি স্নিগ্ধ দীপ্তিতে ভরে উঠেছে! উপেন বলল—কিছু মনে করো না সুলতা দেবী। বন্ধু-স্ত্রীর দেহের ওপর যখন টান্ ছিল, তখন তার রূপ এমন ক'রে আর চোখে পড়েনি। আমার এক বন্ধু সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে কেন যে আবেগে চোখের জল ফেলত তা এখন বুঝতে পাচ্ছি। তোমারও সেই রূপ—যে-রূপ প্রশংসায় বলা যায় না, বর্ণনায় বোঝানো যায় না! আর সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে রূপের প্রশংসা শুনলে তোমার আত্মপ্রসাদ আসে না!

সুলতা স্মিতমুখে তাকিয়ে ছিল। উপেনের মেধা, তার গুণগরিমা, চিন্তাশীলতা এবং আত্মপ্রকাশের সহজ শক্তি,—মনে মনে সুলতা তার তুলনাই খুঁজে পায় না। এই মানুষটিকে মনে মনে সে অন্তত সহস্রবার প্রণাম করেছে।

উপেন একবার বাইরে গিয়ে ঘুরে এল। এসে বলল—ভোরের আলো ফুটছে বাইরে, দুজনে মিলে আজ সূর্যোদয় দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে সুলতা!

সুলতা উঠে বাইরে এল। আকাশের একটা দিক তখন বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। ভোরের ছোট ছোট বিষণ্ণ মেঘগুলির গায়ে অল্প

অল্প লালের আভাস লাগছিল। দূরের গাছগুলি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

পাশে দাঁড়িয়ে উপেন বলল—আমার জীবনে কোনোদিন সূর্যোদয় হয়নি সুলতা!

দীঘির জলের ওপর ঢিল পড়লে যেমন ক'রে কাঁপতে থাকে, সুলতার মনের ভেতরটা তেমনি ক'রেই কাঁপতে লাগল। বলল—আমারও হয়নি উপেনবাবু!

—তোমারও না? স্বামী পেয়েছিলে, ঐশ্বর্য পেয়েছিলে, ভালবাসা পেয়েছিলে, আনন্দ পেয়েছিলে—জীবনের দিনমানটা সমস্তই তুমি ত ভোগ ক'রে নিয়েছ। তবুও দুঃখ বলে তোমার একটা কিছু সম্বলও আছে, কিন্তু আমার—চল আর নয়, এবার রোদ উঠেছে।—একটু হেসে উপেন বলল—আমার বক্তৃতার ভাঁড়ারটি তোমার পাল্লায় পড়ে এবার বুঝি খালি হয়ে গেল!

কুলিটা এতক্ষণ কোথায় অপেক্ষা করছিল—এবার এসে বাক্সটা মাথায় তুলে নিল।

গেট-এর কাছে আসতেই সুলতাকে দেখে টিকিট্-কালেক্টর্ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল—টিকিট সে আর নিলই না!

ধুলা-ধূসরিত পশ্চিমের শহরের পথ! সকালবেলায় স্ত্রী-পুরুষ ঝাড়ুদারের জটলা সুরু হয়ে গেছে। পথে পথে দোকান-পসার খুলেছে। মন্দিরে মন্দিরে সানাইয়ের আলাপ চলেছে। নানান্ জাতের মেয়ে-পুরুষ মাঝে মাঝে দল বেঁধে 'রামনাম' করতে করতে প্রাতঃস্নানে বেরিয়েছে। শাঁক, ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দে চারিদিক মুখর। ধূপ-ধুনোয়, ফুলে-পাতায়, চন্দন-গন্ধে বাতাসটি ভর ভর করছে। একটি স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকতার মাধুর্যে সবাই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছে।

যেন একটি নবদিবসের জন্ম হল!

অনেক রাস্তা, অনেক আঁকা-বাঁকা গলিঘুঁজি পার হয়ে, উঁচু নীচু

নানা জাতের পথ অতিক্রম ক'রে দেবনাথপুরার এক পপলতে পারে
মধ্যে একখানি বাড়ীর নীচে দুজনে এসে দাঁড়াল।  স্ত্রীকেই

সুলতা বলল—কড়া নেড়ে ডাকুন ?  পার ?

উপেন থতমত খেয়ে বলল—তাত ডাকব, কিন্তু আমি—আমি কিন্তু কি বলে পরিচয় দেব ?

—বলব আমার স্বামীর বন্ধু।

—দাঁড়াও, সুলতার হাত ধরে উপেন থামিয়ে দিয়ে পুনরায় বলল—যদি তোমার মামা সে কথা না বুঝতে পারেন ?

—ভয় কি!—ব'লে সুলতা দরজার কড়া নাড়ল।

বার তিনেক কড়া নাড়বার পর ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। মুখ বাড়িয়ে এক বৃদ্ধা বলল—কে গা বাছা তোমরা ?

সুলতা বলল—ক্ষিতীশবাবুর বাড়ী ত ? তিনি আমার মামা।

—বটে ? এসো মা এসো। জামাই বুঝি পেছনে ?—ওমা না, এ কে—আহা এতটুকু মেয়ের কপাল পুড়লে কি আর সহজে চেনা যায় মা ? তুমি তবে কে বাবা ?

সুলতা বলল—উনি আমার দেওর বুড়ি মা ?

—ও, তাই নাকি, এসো ভাই এসো, যাও ওপরে, তোমাদেরই ত সব মা, আমি দোর আগলে পড়ে থাকি বইত নয়! যাও ভাই তোমার বৌদিদির সঙ্গে ওপরে!—আর বাছা, তিন টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে কি আর ভাল ঘর পাওয়া যায় ? ক্ষিতীশবাবুকে বলে কত সাধ্য-সাধনা ক'রে তবে—

দুজনে ওপরে উঠে গেল। বাক্সটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে উপেন বলল—কই তাঁরা ?

সুলতা বলল—বুড়ি মা, মামারা কই ?

নীচে থেকে বুড়ি বলল—আর মা, ক্ষিতীশ এখানে থাকলে আর ভাবনা কি! দিনাজপুর ছেড়ে তার কোথাও থাকবার যো নেই। মামী আছেন, আর বড় ছেলে। ছেলের এই ত গেল মাসে বে হল!

—কই তাঁরা ?

অল্প লালে"—জানো না? পেরাগে গেছে যে! আসবে আবার হয়ে উঃই!

সুলতা ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। উপেন বলল—তাই ত, 'অভাগা যেদিকে চায়…'যাক্ দু'চারদিনের মধ্যে এলেই হল! আপনি ত আর জলে পড়লেন না! কিন্তু ভাল কথা, আপনি এবার কিঞ্চিৎ আহারের ব্যবস্থা করুন দেখি? বাঙালীর ছেলে, অন্নগত প্রাণ, ভাত দুটি খাই আর নড়ে চড়ে বেড়াই।

বুড়ির সঙ্গে সহযোগ ক'রে সুলতা রান্নাবান্নার ব্যবস্থায় মন দিল। পয়সা হাতে পেয়ে বুড়ি বাজারে গিয়ে কেনা-কাটা ক'রে নিয়ে এল। নিজের ঘরের শিল্-নোড়ায় বাট্না বেটে দিল, কুট্নো কুটে আনল। বুড়ি আজ চল্লিশ বছর কাশীবাস করছে!

বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় স্নানাহার সেরে উঠে দুজনে এসে বসল।

উপেন বলল—তারপর?

সুলতা বলল—পেট ভরেছে আপনার?

একটু হেসে উপেন বলল—কেন, হাঁড়িতে তোমার আরো কিছু আছে নাকি?

—না থাকলেও আবার তৈরী ক'রে দিতে পারি।—সুলতা বলল।

উপেন বলল—থাক্ বৌদি, এখনকার মত সত্যিই পেট ভরেছে। ক্ষিধে পেলে আবার কোনো সময় এসে খেয়ে যাব—কেমন?

—কবে আবার আসবেন বলুন?

উপেন এবার হাসল। বলল—এত ক'রে খাইয়েও কি তোমার তৃপ্তি হল না?

সুলতা বলল—আমি এখানেই এখন থাকব, এলে এখানে এসেই উঠবেন।

—আবার যখন আসব, তখন চিন্‌তে পেরে জায়গা দেবে ত?

সুলতা মাথা নীচু ক'রে ঘাড় নেড়ে জানাল, দেবে।—তা বলে

এঁদের আসার আগেই যেন চলে যাবেন না !—আপনাকে পারে থাকতে হবে দিন দুই ! স্ত্রীকেই

—থাকতে হবে ? উপেন একটুখানি হেসে বলল—পরীক্ষায় পাশ ? ক'রে গেছি সুলতা,—তা বলে আর নয় ! আমাকে যেতেই হবে এবং আজই যাব।—তুমি ভাবচ বোধ হয় তোমার চলবে কেমন ক'রে ? কিন্তু চলবেই। চিরকালই চলবে ! সংসারে কারো জন্যে কারো আটকায় না !

সুলতা কথা বলল না।

নীচে বুড়ির গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। দেশ থেকে ভাইপো আজও মাসকাবারি টাকা পাঠায়নি—বুড়ি তাই গালাগালি দিয়ে ভূতছাড়া করছে।

সুলতা বলল—এবার গিয়ে আপনি কি করবেন ?

—কি করব ! হয়ত অনেক কিছুই করব, কিংবা কিছুই করব না ! সমস্ত সকালই হয়ত আমার জান্‌লার ধারে বসে মরা নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকব, দুপুরবেলা রোদে রোদে টহল দিয়ে বেড়াব, সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার ঘরে হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকব, আর রাতের বেলা ? চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় কাঁকর ফুটবে, আলো-নেবা ঘরের মধ্যে অশরীরী মানুষের ছায়ামূর্তি দেখে ডরিয়ে উঠব, বিধাতার নিন্দা করব, নিজেকে দেব বারে বারে অভিশাপ ! সুলতা, এত রকমেও কি চব্বিশটা ঘণ্টা কেটে যাবে না ?

বিদায় দিতে গিয়ে সুলতার চোখে এল জল !

উপেন একবার তার দিকে তাকাল, তারপর নিজের মনেই আবার বলল—সুলতা, আমাকে বেঁধে রাখবার অনেক বস্তুই তোমার হাতে ছিল। পদ্ম-পলাশের মত ছিল তোমার কালো চোখ, শ্রাবণের মেঘের মত ছিল তোমার চুল, দুধে-আলতার মত তোমার শ্রী, চাঁপার কলির মত তোমার হাত-পা'র আঙুল,—সকল কালের মানুষ, সর্ব-কালের দেবতা নারীদেহের যে ঐশ্বর্য নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে, তার চেয়েও বেশী আমি তোমার কাছে পেতাম ! কিন্তু এবারের মত থাক।

অন্ন-দেহের কারাগার থেকে এবার আমি মুক্তি নিলাম। মনে না এ সংযম। ভেবো না যে আমার নীতিবোধ জেগে উঠেছে! হচ্ছে আমার নিজের প্রতি সহজ বিচার। সুলতা, পরের জন্মে চোখ দুটো যদি আনি, দৃষ্টিহীন হয়ে আসব! যেন আসবার সময় সাংসারিক বিষয়-বুদ্ধি নিয়ে আসি, বুকের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আত্মনাশী কামক্ষুধা থাকে, অজ্ঞতা যেন সে-জীবনকে চিরদিন অন্ধকার ক'রে রাখে,—হৃদয়বৃত্তিকে যেন একেবারে নির্বাসন দিয়ে আসতে পারি!

বলতে বলতে উপেন উঠে দাঁড়িয়ে গলার আওয়াজটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে পুনরায় বলল—সময় আর নেই, ওঠো সুলতা। বেলা তিনটের গাড়ী!

সুলতা উঠে বাইরে এল। নীচে বুড়ি বোধ করি তখন দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ির অনেক জ্বালা!

জিনিস-পত্র গুছোতে গুছোতে উপেন বলল—সুলতা আমাকে তুমি যে-চোখেই দেখ না কেন, তোমার সমস্ত কথার আড়ালে আমার কেবলই মনে হয়েছে সত্যেনকে তুমি সত্যিই ভালবাসতে! একি সত্যি নয়? বল ত, হ্যাঁ কি না?

সুলতা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ!

উপেন বলল—বেশ তা যেন হল, কিন্তু—আচ্ছা বল ত আমার মুখের দিকে চেয়ে,—না না, ওকি—লজ্জা করলে চলবে না কিন্তু—আচ্ছা বল ত, এখন থেকে সমস্ত জীবন যদি তোমাকে আমার কাছে রাখি, থাকতে পারবে?

সুলতা একটু অস্থির হয়ে বলল—যাবার সময় একথা আর কেন জিজ্ঞেস করছেন? একথা জেনে গিয়ে আপনার কি লাভ?

—এমনি; বড় সাধ হয়েছে তাই! সতী-সাবিত্রী স্ত্রীলোকের মুখ-নিঃসৃত বাণী আমার বড় ভাল লাগে! আমি শুধু দেখছিলাম, তোমার কোন্ কথার আঘাত পেয়ে মানুষ আত্মহত্যা ক'রে বসে।

দুটি বিশাল দৃষ্টি তুলে সুলতা তার মুখের দিকে তাকাল। উপেন একটু হেসে বলল—চোখ নামাও বৌদি, তোমার ও-দৃষ্টির

কাছে সতীত্বের এবং অসতীত্বের কোনো আলোচনাই চলতে পারে না! আচ্ছা, আমি যদি বলি, যে-কোনো পুরুষ, যে-কোনো নারীকেই তুমি একই রকম ভালবাসতে পারো তাহ'লে কি খুব ভুল করব? যদি বলি তোমার জাত নেই, ধর্ম নেই, সমাজ নেই, নীতি নেই—তুমি শুধু নারী, শুধু ফোটবার জন্যেই ফুটে উঠেছ—তা হলেও কি খুব,—দেখ দেখি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে? কে যেন ডাকছেন?

সুলতা মুখ ফিরিয়ে ওপরতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলল—আমার দেওর! এখুনি চলে যাচ্ছেন! উঁহু—না, উনি আর থাকতে চান না।

উপেন বলল—কে? কার সঙ্গে কথা কইলে?

সুলতা বলল—দেখেননি বুঝি? উনি সন্ন্যাসিনী। কাশীতে কি সব কাজের জন্যে এসেছেন! এসেছেন হরিদ্বার থেকে।

বেলা দুটো আন্দাজ উপেন জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে এল। সুলতাও এল পিছনে পিছনে। দরজার বাইরে এসে উপেন বলল—বিদায়ের দৃশ্যকে মনোহর ক'রে আর কাজ নেই। সুলতা তুমি এবার ওপরে যাও।

সুলতা বলল—কবে আসবেন বলুন!

উপেন করুণ হাসি হেসে বলল—গ্রহতারার চক্রে আবার কোথাও দেখা হয়েও যেতে পারে! অনেক অপরাধ ক'রে গেলাম, ক্ষমা করো।

সুলতা হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিতেই উপেন তাকে দুই হাত ধ'রে তুলল। বলল—পায়ের ধুলো নিয়ে কেন আমাকে অকারণ গৌরবে বড় ক'রে তুলচ সুলতা?

হাত দুটি ধরে কয়েক মুহূর্ত সে কি-যেন চিন্তা করল, তারপর একটি ছোট্ট অলক্ষ্য নিঃশ্বাস ফেলে সে সুলতাকে ছেড়ে দিয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। ব্যাগটা নিয়ে রাস্তায় নেমে কিয়দ্দূর গিয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে থমকে দাঁড়াল। সুলতা তখনো তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

উপেন একটু হাসবার চেষ্টা করল—পারল না, কথা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁটই কাঁপল, কথা বেরুল না।

আবার সে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। পানের একটা দোকান পার হয়ে সে যখন নিতান্তই চোখের আড়ালে চলে গেল, সুলতা তখন দরজার কপাটে মাথা হেলিয়ে কান্না আর সামলাতে পারল না, ফুলে ফুলে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে লাগল! মাটির বন্ধন থেকে শিকড় টেনে ছিঁড়লে মাটির বুক ক্ষতবিক্ষত হয় বই কি।

॥ ৯ ॥

সন্ন্যাসিনী!

পরিণত যৌবন, কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট—শীর্ণ! দেহটি ঠিক দেহ নয়,—দেহযষ্টি! কপালখানি ছোট, ঘাড় অবধি কোঁকড়ানো কালো কালো ঝাঁপা ঝাঁপা চুল, চোখ দুটি দীঘির জলের মত স্বচ্ছ, গভীর এবং মমতাময়,—পাতলা দুখানি ঠোঁট, নাকটি বাঁশীর মত; মুখখানি ঠিক বিষণ্ণ নয়—অরণ্যের মত উদাসীন।

পরনে গেরুয়া রঙের একটি শাড়ী ও শেমিজ। পায়ে গেরুয়া রঙের ক্যাম্বিসদড়ির জুতো!

সন্ন্যাসিনী ওপর থেকে নেমে এলেন। পিছনে পিছনে এল আর একটি সমবয়স্কা যুবতী মেয়ে; বোধ করি শিষ্যা হবে।

—মামা তোমার আসবেন কবে, হ্যাঁ মা?

সুলতা অশ্রুপূর্ণ দুটি চোখ তুলল। ঘাড় নেড়ে জানাল, সে জানে না।

আহা মা, তোমার মতন মেয়েরও এমন হয়? সকাল থেকে আমি কেবল তোমার কথাই ভাবছি মা!

ছোট্ট পাখীটির মত সন্ন্যাসিনীর গলার আওয়াজ। এই করুণ মৃদু

কণ্ঠের মমতাটুকু, মনে হল সুলতার অন্তরের বহুদূর পর্যন্ত একটি সুনিবিড় মাধুর্যে ভরে তুলল। কোনো কোনো কণ্ঠস্বর মানুষকে মোহাবিষ্ট ক'রেই তোলে!

এখন তবে কার কাছে থাকবে মা?

সুলতা বলল—মামীমা আসবেন কিছু দিনের মধ্যেই!

ও আচ্ছা, তবে এ-কদিন তুমি আমার কাছেই থেকো মা! নীচে ড়ি মা'র কাছে থাকা তোমার-ত ভাল লাগবে না?—সুলতার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সন্ন্যাসিনী আবার বললেন—শীতলা, তুমি এঁর রান্নার ব্যবস্থা আমার কাছেই করো! আহা মা, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে দেখে অবধি। দুঃখকে আমরা অস্বীকার করলেও দুঃখ থেকে যায় মা। সবাই আমাদের ছেড়ে যায়, দুঃখ কিন্তু আমাদের কাছছাড়া হয় না, আমরা আশ্রয় না দিলে সে যায় কোথায়? আহা মা—

সুলতা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, তারপর নিতান্ত ভক্তিভরে মাটিতে বসে পড়ে দুই হাতে পায়ের ধুলো মুখে ও মাথায় তুলল!

প্রণাম ক'রে সে উঠে দাঁড়াল। বলল—আপনাকে কি বলে ডাকব?

—আমাকে? সন্ন্যাসিনী অল্প একটুখানি স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। হেসে অতি মৃদুকণ্ঠে বললেন—কি বলে ডাকবে? আমার নাম মা!

সুলতা ঘাড় নেড়ে তাতেই রাজী হল। তারপর চোখ তুলে মায়ের স্মিত মুখখানির প্রতি তাকিয়ে তার মনে হল, এর চেয়ে বড় আশ্রয় তার আর নেই! মায়ের চোখে মমতা, কণ্ঠে কারুণ্য, হৃদয়ে অপরিসীম সহানুভূতি—সন্ন্যাসিনী তার হারানো মাতৃস্নেহের স্বপ্নকে বহন ক'রে এনেছে।

শীতলা বোধ করি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতেই ওপরে উঠে গেল!

আনন্দের একটি অব্যক্ত বেদনায় সুলতার চোখ দুটি দিয়ে জলধারা নেমে এসেছিল। মা কাছে এলেন। মাথাটি টেনে বুকের

উপেন ধৈর্য্যে নিয়ে পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন—এমন করলে ত চলবে না মা, আমি যে তোমার সকল কথাই বুঝতে পারি! হয়ত ঠিক সময়টিতেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, তোমাকে যে আমি দেখেই চিনেছি! আহা মা—

অবরুদ্ধ কণ্ঠে সুলতা শুধু বলল—এখানে ছাড়া আর আমার কোথাও জায়গা নেই মা!

সন্ন্যাসিনীও তার উত্তরে কেবল বললেন—ভয় থাকলে ত জীবনে কোনো আনন্দ নেই মা! ভয়কে জয় করতে হবে যে!

সুলতা চোখ নামিয়ে চুপ ক'রে রইল।

সন্ন্যাসিনীর সত্যকারের কোনো পরিচয়ই ছিল না। সাজানো ধবধবে দাঁতগুলিতে ও আয়ত দুটি ঘননীল চোখে সুন্দর একটুখানি হাসি হেসে বলেন—জাত? জাত ত আমার নেই মা; মানুষ—এ ছাড়া আর কোনো কথাই ত বলা চলে না! তা ছাড়া ভুলতে যাকে হবে তাকে ভোলাই ত ভাল মা!

মা যখন কথা বলেন মনে হয় তিনি যেন নিজেকেই বলছেন! নিজের কথা নিজে শুনেই তাঁর যেন সকলের চেয়ে বড় তৃপ্তি। মুখটি কথা বলে, মনটি থাকে কান পেতে। বয়সের দিক দিয়ে মা হবার অধিকার তাঁর নেই, দার্শনিকতাও তাঁর মুখে ঠিক মানায় না। তবু সমস্তটাই যেন তাঁর সকল হাবভাবে, গতিতে-ভঙ্গীতে, কথাবার্তায়, পোষাক-পরিচ্ছদে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

নির্জন একাকীত্ব সুলতার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আপনার মনে কোথাও চুপ ক'রে বসে সে মায়ের কথাগুলি নিয়ে নেড়েচেড়ে একটু একটু ক'রে উপভোগ করে। এ যেন এক সে নতুন জীবনের মাঝখানে এসে পড়েছে। মত্ত উত্তেজনায় নিত্যস্রোতের বেগে যে-জীবন আঘাত পেয়ে পেয়ে আবর্তে আবর্তে ঘুরে ঘুরে চলে, যে-জীবন মন্থনে ওঠে জ্বালা, বেদনা, শোক, হিংসা, হলাহল,—এ জীবন সে নয়! এখানে মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, ধূপ-ধুনা

চন্দনের সংমিশ্রিত গন্ধের মায়া, সাধু-সন্ন্যাসী-ভিখারীর ছন্নছাড়া বাঁধনহারা জীবন,—দেব-দেবী-পূজারী, মোহান্ত-ভৈরবী-নাগা প্রভৃতির এখানে অবাধ একাকার রাজ-রাজত্ব! এমনটি সুলতা আর কোনো দিন দেখেনি। ধর্মভাবের একটি একান্ত স্নিগ্ধতা, একটি সুন্দর প্রার্থনার আবহাওয়া, বেদনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে এমন দুর্লভ ইঙ্গিত—সমস্ত আকাশ বাতাসকে মনোরম ক'রে রেখেছে। যাকে পেয়ে সুলতার জীবন যেন সার্থক হয়ে ওঠে! একটি অপূর্ব শুচিতার ভেতর দিয়ে তার দিন কাটে।

সেদিন সকালবেলায় সুলতা যখন পূজার ঘরের দোরের কাছে এসে দাঁড়াল তখন সহজে তাকে আর চেনবারই যো নেই। চন্দন-চর্চ্চিত তার কপাল, মাথার চুল পেছন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো, গলায় একগাছি ছোট রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা, পরনে একখানি পুরু গেরুয়া থান—দুহাতে শুধু দুগাছি সোনার চুড়ি—চুড়ি দুগাছি তাকে আর খুলতে দেওয়া হয়নি। এসে দাঁড়াল মূর্তিমতী একটি স্তবের মত!

পুষ্পপাত্রটি দুহাতে ধরে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে বলল—জবাফুল ত এখন পাওয়া গেল না মা?

মা বললেন—গেল না? আহা মা, শিবের পূজোয় ত জবাফুল লাগে না! তাঁর পূজো আকন্দে, ধুতরোয়—তাঁর পূজো হয় বকফুলে!

—ও। ব'লে সুলতা ভেতরে ঢুকে ফুলের থালাখানি নামিয়ে রাখল। সন্ন্যাসিনী একবার সেদিকে তাকিয়ে একটি বেলপাতা হাতে তুলে নিয়ে বললেন—পাগলি, বেলপাতা কি এমনি ক'রে বাছে? আহা মা, বেলপাতা হবে তে-পত্তর! তিনটি পাতা ত্রিশূলের মত দেখাবে। বেলপাতা মনের মতন ক'রে পেলে ভোলানাথ সব ভুলে যান্!

সুলতা বলল—জবার কথা তখন যে বলছিলেন?

মা একটু হাসলেন। বললেন—দিনে শিব পূজো মা, জবা দিয়ে রাতে হবে মুণ্ডমালিনীর সেবা। সন্ধ্যেবেলায় শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন।

—ও। সুলতা যেন এতক্ষণে সমস্তই বুঝতে পারল।

মা ও শীতলার পূজার পর সুলতা গিয়ে অন্য একখানি আসনে বসে। পূজার সে না-জানে কোনো মন্ত্র, না-কোনো রীতি। আচমনের জল কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয় তা পর্যন্ত তার এতটুকু জানা নেই। গঙ্গাজলের ঘটির মধ্যে একখানি কুশি উপুড় ক'রে রেখে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে সে চোখ বোজে।

কিন্তু চোখ বুজলেই পূজো হয় না! হাত নাকি কেমন এক বিশেষ ভঙ্গীতে ঘুরোতে হয়, মৃত্তিকার টিপ্ দিতে হয় কপালে, চন্দনের ফোঁটা দিতে হয় নানা অঙ্গে! পূজার এই সামান্য ভূমিকাগুলি পর্যন্ত তার একেবারে অজ্ঞাত।

—ঘুরে বসো মা, না না—ও হল না! জান্‌লার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসো। আহ্নিকে বসতে হয় পূব দিকে মুখ ফিরিয়ে!

তাইত, এই সামান্য কথাটাও তার জানা ছিল না? লজ্জায় সুলতার মুখখানি, টকটকে রাঙা হয়ে ওঠে!

মা পাশে বসে তাকে সমস্তই দেখিয়ে দেন। পরম যত্নে এবং পরম আগ্রহে নৈবেদ্যের থালা সাজিয়ে সুলতা ফল-পাকড় কাট্‌তে বসে! সকল কাজেই তার দেরি হয় কিন্তু কোথাও খুঁত সে এতটুকু রাখে না। দেবতার নৈবেদ্য সাজাতেই যেন তার এই সুন্দর দুটি হাত তৈরী হয়েছিল। পূজার সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে করতে দুনিয়ার আর কোনো কাজের প্রতিই যেন তার আর খেয়াল নেই—একান্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে এক-একটি ফুল ফল পাতা সাজিয়ে গুছিয়ে যত্ন ক'রে রাখে। আজকাল সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়, দেবতার এতবড় নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে সে এতদিন ছিল কোথায়? জীবনকে সুন্দর ক'রে সহজ ক'রে নির্মল ক'রে ফুটিয়ে তোলবার এই সুবৃহৎ ক্ষেত্র তার চোখের সুমুখে অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল, এর সন্ধান কি আজ পর্যন্ত তাকে কেউ দিল না?

মন্দিরে মন্দিরে যখন আরতির শঙ্খঘণ্টা বেজে ওঠে, সেই ধ্বনিকে আশ্রয় ক'রে সুলতার সমস্ত মন পাখীর মত পক্ষ বিস্তার ক'রে বহুদূর

পর্যন্ত উড়ে উড়ে যায়—দূরে, আরও দূরে…অনেক উঁচুতে, শূন্য-লোকের অসীম আকাশের মধ্যে। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড যাত্রীঘরের চূড়ায় যখন সানাইতে ইমন-কল্যাণ বাজতে থাকে, চাঁদের আলোয় তখন হয়ত নদীর জল ঝলকে ঝলকে ছুটে চলেছে, ওপারের পুঞ্জীভূত নিস্তব্ধ অরণ্য-রেখা চন্দ্রালোকের স্পর্শে স্বপ্নরাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে—সেই সময় ভীরু দীপশিখার মত সুলতার ছোট প্রাণ থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে। মন যেখানে উড়ে চলে গেছে. হৃদয় এবং প্রাণ সেখানে যাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে।

সমস্ত সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পূজায় কাটে। আহারাদির ব্যাপারটি, অতি সামান্যই—সমস্ত দিনের মধ্যে এটি কোন্ সময় যে শেষ হয়ে যায় তা কারো দৃষ্টিতেই পড়ে না। তারপর বিশ্রাম অতি অল্পক্ষণ! দুপুরবেলা মায়ের সঙ্গে সে যায় 'গোপাল বাড়ী' হরিসভায়, সেখান থেকে উঠে যায় বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতি দর্শনে। বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যায়,—শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু তা হোক—এই জীবনই মানুষের চিরদিনের অভিপ্রেত। রাতের বেলায় একটি টিম্‌টিমে আলো জ্বেলে মাকে সুলতা গীতার বাঙলা অনুবাদ পড়ে পড়ে শোনায়।

মা বলেন—জ্ঞানের সীমা আমার বড়ই ছোট, বুঝলে মা? নিজে যেটুকু বুঝতে পারি তোমাকেও সেটুকু দিতে পারব বোধ হয়! যে কথা আমাদের ভাবায় সেই কথাই হচ্ছে জ্ঞানের কথা!

দীপশিখার পাশ দিয়ে সুলতার দুটি বড় বড় কালো অচঞ্চল চোখ এবং স্নিগ্ধ শান্ত ও সুন্দর মুখখানি মায়ের নজরে পড়ে। মায়ের প্রতি খানিকক্ষণ তাকিয়ে সুলতা আবার বই-এর পাতা উল্টে নেয়।

অনেকক্ষণ রাত পর্যন্ত পড়তে পড়তে কোন্ এক সময় তন্দ্রায় সে দেয়ালে মাথা কাত ক'রে ঢুলে পড়ে। মা উঠে পরম স্নেহে তার গায়ে হাত দিয়ে বলেন—এসো মা, শোবে'এসো, আহা মা, এ ত তোমার অভ্যেস নেই, কষ্ট হবে বইকি!

সুলতা জেগে উঠে বলে—ও ভুলে গেছি, আমি বড় ঘুম কাতুরে!

মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও সুলতা আর ঘুমোয় না। যতক্ষণ সে পারে জেগে থাকে এই আনন্দ, এই তৃপ্তি, এই শান্তিকে উপভোগ ক'রে নিতে চায়।

—পাছ তলায় বসলে কেন মা? পায়ের কাছে কেউ বসলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এবার তুমি শুয়ে পড় মা।

সুলতা শোনে না, আস্তে আস্তে মায়ের পা দুখানিতে হাত বুলিয়ে দেয়। গভীর রাত পর্যন্ত এমন অক্লান্ত পদ-সেবায় মা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। সুলতার চেয়ে বয়সে তিনি কতই-বা বড়। বড় জোর বছর তিনেকের! কিন্তু সমবয়সের সংস্কার সুলতার মনে থাকে না। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে গৌরবে মা যে তার চেয়ে অনেক উঁচুতে এ যেন কেমন ক'রে তার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে। দেবতাকে সে চোখে দেখেনি কিন্তু মনে হয়—এমনিই। মুখে এমনিই স্বর্গীয় দীপ্তি, হাসিতে আশীর্বাদ, চোখে প্রীতি, হাতে বরাভয়, অঙ্গে এমনিই ঐশ্বর্য! মা যেন তার এ জগতে থেকেও নেই, দেবলোকের সঙ্গে তাঁর যেন একটি অবিচ্ছন্ন যোগাযোগ আছে; বিধাতার বাণীকে মা যেন বহন ক'রে এনেছেন!

গভীর রাতের ছমছমে অন্ধকারে সুলতা মা'র পায়ের ওপর ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে মাথা লুটিয়ে দেয়। পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে মাথা সে আর তুলতেই চায় না। নিদ্রিতা মা'র পা দুখানি সে চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ পরে পা দুখানি ছেড়ে দিয়ে সে উঠে আসে। ঘুম তার চোখ থেকে চলে যায়। জানালার ধারে চুপ ক'রে সে খণ্ড আকাশের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। গত জীবনের কথা এতটুকুও তার মনে পড়ে না,—যত কিছু তার বর্তমানকে নিয়ে। এই জীবনের সকল পাওয়া যদি তার শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তো তার এতটুকুও দুঃখ নেই, যে অবলম্বনটিকে সে হাতের মধ্যে পেয়েছে একে

নিয়েই সে তার জীবনের সকল ছোট ছোট দুঃখ ও বেদনাগুলিকে পার হয়ে চলে যাবে।

শ্রাবণের প্রথমেই বর্ষা নেমে আসে। ধূলিপথের প্রান্তে আকাশের কোলে কোলে স্নিগ্ধ সজল মেঘ জমে ওঠে। বিদেশিনী মেয়েরা রঙিন কাপড় পরে কদমের গোছা হাতে নিয়ে, কেউ মাথায় গুঁজে, কেউ গলায় ও কোমরে মালা ক'রে দুলিয়ে শাওনের গান গেয়ে গেয়ে রাস্তা পার হয়ে যায়। মেঘের ইঙ্গিত পেয়ে নদীর জল ফুলে ফুলে ওঠে।

তারপর দেখতে দেখতে জলধারা নেমে আসে। এ বর্ষা সুলতাকে আর চঞ্চল করে না, রক্তের মধ্যে আর দোলা দেয় না,—মনে হয় তার সমস্ত সত্ত্বাকে যেন এক-একটি ফোঁটায় স্নিগ্ধ শান্ত ক'রে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে গিয়ে সে খোলা ছাদের ওপর দাঁড়ায়। মাথায় যেন তার ভাগ্যবিধাতার আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে!

মেঘ-মেদুর বর্ষায় সন্ধ্যা ক্রমশ চারিদিকে ঘনিয়ে আসে। সুলতার মন আর ব্যাকুল হয় না, প্রদীপটি জেলে হাতের মধ্যে আড়াল ক'রে এসে সমস্ত ঘরে আলোক পরিবেশন ক'রে এক জায়গায় গিয়ে সে গীতার মধ্যে জগতের যত কিছু সে দেখতে পায়, দুনিয়ায় এই গীতা ছাড়া চিন্তা করবার অন্য আর কোনো বস্তুই নেই! ওদিকে ঝরঝর ক'রে কার্নিস বেয়ে জল পড়ে, তেতলার নলের ভেতর খলখল ক'রে জলের শব্দ হয়, জান্‌লা দিয়ে বৃষ্টির ছাট্ আসে, জল ও হাওয়া চারিদিকে কান্নার আওয়াজ ক'রে যায়, নালা-নর্দমা, উঠোন ওপরের সিঁড়ি, পথ-ঘাট—যা কিছু সমস্তই একে একে জলে ভর্তি হয়ে ওঠে।

সুলতা একবার ওদিক এদিক তাকিয়ে আবার গীতার অনুবাদের মধ্যে মনোনিবেশ করে। গীতার মধ্যে কোথাও বর্ষার বর্ণনা থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত! এ বইখানি ছাড়া অন্য কিছু ভাববার তার যেন আর সময়ই নেই! সে যেন সমস্তই ভুলে গেছে!

সন্ন্যাসিনী মা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। এবার বললেন —অন্ন বিতরণ না করলে ক্ষতি নেই কিন্তু পরমান্ন যে সবাইকে দিয়ে খেতে হয় মা ?

স্থলতা মুখ তুলে তাকাল। শুধু বলল—আসুন !

মা বললেন—বসবার আগে শীতলার খোঁজটা আমাদের নিতেই হবে। বৃষ্টি-বাদল হলে শীতলা আর ছুঁচে সুতো পরাতে পারে না মা, মনটা হয়ে যায় তার বিবাগী।

স্থলতা এবার উঠে শীতলাকে ডাকবার জন্য পা বাড়াল।

মা বললেন—শোন, তাকে ডেকে আনবার আগে এইটি জেনে যাও মা যে,মুখ বুজে কাউকে নালিশ না জানিয়ে চিরদিন যারা অকারণে দুঃখ সয়ে যায়—শীতলা হচ্ছে সেই দলের মেয়ে। তার দুঃখের হদিস আজ অবধি মানুষে পেল না, মানুষের চেয়ে যে বড় সেও পেল না! শীতলাকে এখানে ডেকে আনবার আগে এইটুকু মনে মনে জেনে যাও মা !

স্থলতা মায়ের মুখের দিকে একবার স্পষ্ট ক'রে তাকাল। বাদল-বেলায় স্বল্প অন্ধকারে মনে হল মায়ের কোমল সুন্দর কচি মুখখানির ওপর দুটি চোখের আলো পড়ে স্নিগ্ধ দীপ্তিতে ভরে গেছে। হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

জলের একটা বালতি পাশে রেখে শীতলা বসে বসে মায়ের গেরুয়া কাপড়ে সাবান মাখাচ্ছিল। স্থলতাকে পাশে এসে বসে পড়তে দেখে সে একটুখানি হাসল। বলল— তোমাকে দেখে ভাই আমার কেবলই দুঃখ হয়, কেন আমি পুরুষ হয়ে এলাম না! প্রেমে যদি পড়তাম তোমারই প্রেমে !

স্থলতা অনুযোগ ক'রে বলল—এ সময় বুঝি তোমার এই কাজ দিদি ?

মন্দ কি? শীতলা বলল—শুনেছি বাদলার দিকে চেয়ে বসে থাকলে প্রিয়-বিরহে চোখে জল আসে। তুমি যে গীতা পড়ছিলে, অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগছিল না ?

সুলতা তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর একটু একটু ক'রে ক্রমে তার মুখখানি চমৎকার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল—উঃ, তুমি কিন্তু ভারি চালাক দিদি। এসব জানলে কি ক'রে ?

শীতলা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বলল—পুঁথিগত বিদ্যে !

সাবান লাগানো কাপড়খানা হাত দিয়ে চেপে ধরে সুলতা বলল—এবার আমাকে দাও দিদি। তুমি বুঝি সমস্ত সন্ধ্যেটা এই কাজ নিয়েই থাকবে ? ভিজে ভিজে অসুখ করবে না ?

শীতলা বলল—হয়ে গেছে। আর দেরি নেই ভাই। মায়ের কাজে কি আর সময় অবসর আছে ?

কাপড় কেচে নিঙ্ড়ে শীতলা দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। তারপর নিজে সে পিছন ফিরে কাপড় কেচে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মা রইলেন পূজার ঘরে। সুলতা গীতাখানি এনে শীতলার ঘরে ঢুকল।

শীতলা বলল—দূর! আজ আবার বাইরের বই পড়া কেন ? আজ বসে নিজের মনের কথা শুনতে হয়। গীতা আজ মাথায় থাকুন।

কোণের জানালাটা পূব-মুখো। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শীতলা বলল—দেখছিস, ওপারের বন কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে।

—হুঁ !

—ওই যে গঙ্গার চড়া আর একটুখানি বাকি আছে, ওটুকু দু' এক-দিনের মধ্যেই ভরে যাবে। বর্ষাকালে কাশীর গঙ্গার কী রূপ ! এপার ওপার দেখলে ভয় করে !

শীতলার সম্বন্ধে মায়ের মন্তব্যগুলি তখনও সুলতার কানে বাজছিল। বলল—দিদি, এবার তোমার নিজের কথা বল।

নিজের কথা ? পাগলী কোথাকার ! নিজের কথা সমস্তই যে মায়ের পায়ে ঢেলে দিয়েছি ? নিজের বলে ত আমার কিছু নেই ভাই !

সুলতা চুপ ক'রে রইল। শীতলা হাসতে হাসতে বলল—বুড়ো মাগী, বিয়েও করলাম না, ঘরও করলাম না—নিজের কথা পাব কোথায়?

তা বটে! এত বড় আত্মদানের আদর্শ সুলতা সারাজীবনেও দেখেনি!

কোনো গ্লানিই শীতলার মধ্যে ছিল না। কথা যখন সে বলে ভিতরটা যেন তার বাঁশীর মত বাজতে থাকে। সমস্ত জীবনটাই যেন তার নিজের কাছে সহজ হয়ে গেছে!

হাসতে হাসতে সে বলল—পাঁচ-পাঁচীর মত চেহারা এনে সংসারে কিছুই করতে পারলাম না ভাই। তোমার মতন রূপ থাকলে না হয় বানিয়ে বানিয়েও গল্প বলা যেত! জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, আয়—

ব'লে শীতলা তাকে কোলের কাছে টেনে আনল। বলল—ছোট বোন ত আছিসই, এবার আমার মেয়ে হলি। কিন্তু তুই আমার স্ত্রী হলেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হ'ত!

সুলতার মুখটি লাল হয়ে উঠল। কাছে বসে সে শীতলার গলা জড়িয়ে ধরে বলল—আমি তোমার চুল বেঁধে দেব দিদি।

শীতলা চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল—সে কি, মা এসে পড়বেন যে।

—পড়লেই বা।

—দূর। এসব যে করতে নেই। উঠে গিয়ে আগে তুই একবার দেখে আয় তাহলে?

সুলতা বাইরে গিয়ে একবার দেখে এসে চিরুনি হাতে ক'রে এনে শীতলার পিছন দিকে বসে চুল আঁচড়াতে সুরু ক'রে দিল।

—দেখিস ভাই, যেন সিঁথে কাটিসনে! তাহলে গেরুয়া ছেড়ে কালা পেড়ে শাড়ী পরতে হবে।

বহুদিন পরে শীতলার মাথায় চিরুনি উঠেছে। আরামে ও স্বস্তিতে তার চোখ বুজে এল। মাথার মধ্যে তার মাটি জমে উঠেছিল।

চুল বাঁধা হয়ে যাবার পর শীতলা বলল—আয়না এনে দে। ইচ্ছে হচ্ছে ভাই, চুল এবার খুলে এলোমেলো ক'রে দে।

—সে কি দিদি ?

চোখ পাকিয়ে শীতলা বলল—তবে কি সেজেগুজে পান মুখে সন্নিসিগিরি ফলাব ? দে, শিগগির চুল খুলে দে।

রাগ ক'রে হাসতে গিয়ে অলক্ষ্যে তার দুটি চোখ চক্‌চক্ ক'রে উঠল !

॥ ১০ ॥

অনুকরণ করা সুলতার প্রকৃতি, অনুসরণ করা তার জীবনের ধর্ম। সন্ন্যাসিনী ও শীতলা—দুইটি গাছকে আশ্রয় ক'রে সে আবার জড়িয়ে গেল ! তবু যে নবজীবনের সুপ্রভাত তার চোখের সুমুখে সুরু হয়েছিল, তার চেয়ে কাম্য আর কিছু নেই ! অগাধ আকাশে আত্মহারা হয়ে গিয়ে সে শান্তি পেয়েছিল।

অখ্যাত কোনো গাঁয়ের নিতান্ত নগণ্য গৃহস্থের মেয়ে সে। মা-বাপ ছিল না, কোনো এক পিসির অনুগ্রহে তার শৈশব গড়ে উঠেছিল। তাল আর খেজুরের জঙ্গলে, আলো-ছায়া ঝিলিমিলি বুড়ো বটগাছের তলায়, চণ্ডীমণ্ডপের আনাচে কানাচে, বাউলদের আখড়ার আশে পাশে কিংবা দীনদাস মুদীর ছোট্ট দোকানটির ঝাঁপির নীচে—এই সব জায়গাতেই ছিল সুলতার খেলাঘর।

সাত বছরের মেয়ে কিন্তু ভ্রমণের সখ ছিল তার অসাধারণ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রতিদিন অকারণে গ্রামের মধ্যে এবং তার চারিদিকে অক্লান্তভাবে সে টহল দিয়ে বেড়াত, কোনো বাধা সুমুখে এসে তাকে রুদ্ধ করত না, ভিতর থেকে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ এক পথ থেকে আর-এক পথে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলত ! ছোট খাল যেখানে নদীতে গিয়ে মিশেছে সেইখানে দাঁড়িয়ে সুলতা প্রায়ই

ক্ষেতের দূরাগত গন্ধের প্রাত তাকিয়ে থাকত, বিলের ধারে বসে সে বক ও মাছরাঙার মৎস্যশিকার লক্ষ্য করত, একাকিনী পল্লীপথের কিনারায় ঘুরে ঘুরে আঁচলের মধ্যে ঝরাফুল ও শুকনো পাতা সঞ্চয় করা ছিল তার অনেক দিনের অভ্যাস। অতি পরিচিত এবং অতি সুলভ বলে তার [illegible] প্রতি নজর দেবার ঔৎসুক্য কারো দেখা যেত না!

আর-একটু বড় হয়ে সে পায়ের ওপর ভর দিয়ে ধানক্ষেতের সীমা নিরীক্ষণ করতে লাগল, আকাশের তারা গোণবার চেষ্টা করল, অঙ্গনের চারিধারে ফুলের চারা বসাবার জন্য মাটি খুঁড়তে লাগল, বাতাসের সঙ্গে মুখের শব্দ ক'রে পাখীর কণ্ঠের অনুকরণ করল। নিরক্ষর রোগপীড়িত সেই চাষীদের গ্রামে সে একটি অভিনব জীবনের আস্বাদন এনেছিল।

চুপ ক'রে সে যখন কোথাও বসে থাকত, মন তার বয়সকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যেত। ভিতরে বিন্দুমাত্রও তার বিষাদ ছিল না, আনন্দ ছিল তার নিত্যসাথী। সূর্যাস্তের ও সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে সে ভাবত, এই গ্রামের পর মাঠ, তারপর নদী, নদীর ওপারে বন, তারপর পর্বত-কান্তার, তারপর···সুলতার ব্যাকুল মন আর কূল-কিনারা পেত না। রাত্রির অন্ধকারে ঘরের ভিতর থেকে তার মন ছুটে চলত। গাছের পাতার ভিতর দিয়ে যে বাতাস গান গেয়ে যায়, সুলতার মন তার সাথে সাথে পরম আনন্দে নৃত্য ক'রে যেত। তার বন্ধন ছিল না, পীড়া ছিল না, বেদনা ছিল না, দুঃখ ছিল না। সে যা দেখত তাতেই খুশী হয়ে ওঠা ছিল তার প্রকৃতি, সে যা পেত তাই অপরিসীম তৃপ্তিতে সমস্ত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করত! সে যেন এ পৃথিবীতে থেকেও নেই! পৃথিবীর সঙ্গে তার যে আত্মীয়তা, সে হচ্ছে ফুলের সঙ্গে গন্ধের, অরণ্যের সঙ্গে ছায়ার, সাগরের সঙ্গে ঢেউয়ের, সৃষ্টির সঙ্গে সৌন্দর্যের! তাকে জানতে গেলে অনুভব করতে হ'ত, ভালবাসতে গেলে দূরে যেতে হ'ত, তাকে আনন্দ দিতে গেলে আনন্দ আহরণ করতে হ'ত!

এমনি দিনে গ্রামান্তরের একটি কিশোরকে সে ভালবাসল। নিজে থেকে সে ভালবাসে ওই প্রথম এবং ওই শেষ। নারীর প্রেম মাত্র একটিবারই সম্ভব! ছেলেটি এসেছিল ঝড়ের মত—প্রগলভ, অস্থির, চকিত-চঞ্চল! মাথায় কালো ঘন কোঁকড়ানো চুল, সম্পূর্ণ মিলিয়েছে বটে! ~~তারপরই সে ভাবে মমতাময়ী মায়ের মা'র কথা।~~ অধরে তলোয়ারের মত একটি সহজ উজ্জ্বল হাসি, কৌতুকে ও মাধুর্যে বড় বড় আয়ত দুটি উজ্জ্বল চোখ, উড্ডীয়মান পাখীর ডানার মত দুটি ভুরু, কঠিন সুপুষ্ট সুগঠিত দেহখানি—গল্প বলত, গান গাইত, সুলতাকে সাঁতার শেখাতো, নৌকার ওপর তাকে চড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দাঁড় বেয়ে নিয়ে যেত। নদীগর্ভের মধ্যে দুজনের ললিত প্রেমগুঞ্জন চলত!

তারপর সেই চঞ্চল কিশোর একদা কোথায় উধাও হয়ে গেল। খোলা জানলায় অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রখচিত অবারিত আকাশ-পথে সুলতা তার প্রেমাস্পদের অপেক্ষা করতে লাগল। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস—কিন্তু আর সে এল না।

তাল আর খেজুর-জঙ্গলের মাথায় যে আকাশ প্রতি রাত্রে তারকার অঞ্জলি এনে ধরত, প্রাচীর-বেষ্টিত সে আকাশের মধ্যে সুলতা হাঁপিয়ে উঠল। সূর্যালোকের সাথে সাথে উদয়াচলের আনন্দ-সংবাদ আর আসে না, বাতায়ন-পথের খণ্ড চন্দ্রালোকে আর সে-মাধুর্য নেই।

এমন দিনে হল তার বিয়ে। স্বামীকে সে কি ভালবাসল? কে জানে। কিন্তু সে আত্মদান করল, স্বামী এসে তার সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করলেন। ভবঘুরে, সমাজ পরিত্যক্ত, আশ্রয়হীন স্বামীটি—স্নেহে, মমতায়, সহানুভূতিতে সুলতা তাঁকে একান্তভাবেই গ্রহণ করল।

স্বামীর সেবাই হল তার জীবনের একমাত্র ব্রত! সমস্ত রাত্রি প্রায় জেগে তাঁর মাথাটি কোলের মধ্যে নিয়ে সে চুপ করে বসে থাকত। স্বামীর জীবনে কোথায় একটি গোপন বেদনা ছিল, সুলতা সেইখানটিতে সান্ত্বনা ঢেলে দেবার চেষ্টা করত। যে-কোনো পুরুষের

পর্শে এলেই তার নারীত্বের সমস্ত মহিমা, অন্তরের নির্মল প্রীতি, মমতার ঐকান্তিক দাক্ষিণ্য একান্তভাবে জেগে উঠত।

প্রেম সুলতার জীবনে ছিল তীর্থক্ষেত্রের মত, সে তীর্থ-সলিল অঞ্জলি ভরে, পান ক'রে সবাই পরিতৃপ্ত হতে পারত। মানুষ তাকে ভুল বুঝে ঘৃণাও করেছে, ভালও বেসেছে; আঘাতও করেছে, উপকারও করেছে, অপবাদও দিয়েছে, অভ্যর্থনাও করেছে।

কিন্তু প্রিয়কে সে হারিয়ে ছিল, আবার স্বামীকেও সে রাখতে পারল না। নিয়তির ক্রূর কটাক্ষে সন্ন্যাস রোগে স্বামীটি একদিন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন!

তারপর এল এক উত্তাল, উদ্দাম চরিত্র! সেই নিষ্ঠুর, সেই ভয়ঙ্কর—সমগ্র নারীকে সে গ্রাস করতে চাইল। মধুচক্রের গায়ে মক্ষিকার মত সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় সুলতার সুন্দর দেহখানির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত! হ্যাঁ, সত্যেন তার প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুর সঙ্গেই মিশে আছে বটে!

সুলতা হাত পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আঘাতের চিহ্নগুলি এবার সম্পূর্ণ মিলিয়েছে বটে! তারপরই সে ভাবে মমতাময়ী মানুর-মা'র কথা। অকস্মাৎ মানুর-মাকে মনে ক'রে তার চোখ দুটি জলে ভরে আসে!

সন্ন্যাসিনীর গাম্ভীর্য নেই কিন্তু একটি স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। মধ্যাহ্ন যৌবনেই তাঁর জীবনের যেন বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল।

সুলতা তাঁকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে—মা, আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?

মা একটু হেসে বলেন—নাই বা শুনলে?

সুলতা তাঁর মুখের দিকে তাকায়। খানিকক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, আপনার বিয়ে হয়েছিল মা?

—তাই বা কেমন ক'রে বলি!

কিন্তু এই সরল মেয়েটির প্রশ্নকে এমন ক'রে এড়িয়ে যেতে

সন্ন্যাসিনী একটু লজ্জিত হন। বলেন—জিজ্ঞাসা কিছু ... গেরুয়া কাপড় গায়ে উঠলে পরিচয়টাকে চেপে রাখতে হয়। আত্মীয় বলব কাকে? কেউ যে কারো নয়—গেরুয়া ত শুধ এই কথাই বলে! —যাই, মন্দির থেকে একবার ঘুরে আসি।

সুলতা বলে—আমিও যাব।

—যাবে? চল! কিন্তু রোদ লেগে যে সোনামুখে রক্ত ফেটে চুবে মা? পথের কষ্ট সইতে পারবে?

—খুব! ব'লে সুলতা চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে মায়ের একেবারে পাশে এসে দাঁড়ায়। এই গেরুয়া পরিহিতা সমবয়সী মেয়েটির প্রতি মা একবার মুখ তুলে তাকান। মনে হয়, এই গেরুয়ার সঙ্গে সুলতার কোথায় যেন একটি মিল আছে। এই অপূর্ব রহস্যময় যৌবনকে এমনি গেরুয়া দিয়ে মুড়লেই যেন সব চেয়ে বেশী মানায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অল্প একটুখানি উত্তেজনায় মুখখানি অতি ঈষৎ রাঙা ক'রে সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে কেন জানি না, মাথা হেঁট ক'রে যাবার সময় বলেন—এসো তবে!

পথে নেমে সুলতা পিছু পিছু চলে। পিছু চলতেই সে ভালবাসে

—আচ্ছা মা, আপনি একলা পথ চিনে চিনে এই সমস্ত কাশী শহর ঘুরে বেড়াতে পারেন? একলা ঘোরা কি আপনার অভ্যেস?

মা বলেন—ঠিক একলা নয়, শীতলা আমার সঙ্গেই থাকে সব সময়! কোনো দুর্গম তীর্থই আর আমার বাকি নেই মা, কিন্তু শীতলা না থাকলে আমি এক পাও—

—শীতলাদি এমন? বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুলতা মায়ের পিঠের দিকে তাকিয়ে পিছু পিছু পথ চলে।

মা বলেন—এমনিই সে! সে মেয়ে কিন্তু পুরুষ হ'লে এর চেয়ে বেশী আর কি হ'ত? সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়, ঘোড়ায় চড়ে ছুটোছুটি করে, হাওয়া গাড়ীর সঙ্গে দৌড়ায়, আগুন নিয়ে খেলা করে! ভয়? [illegible] সে জানলই না! রাস্তাঘাটে কত দুষ্টু লোককে যে সে শাসন [illegible] ছে, জব্দ করেছে, কত লোককে যে সে সোজা পথে নিয়ে

পাশে কোন ইয়ত্তা নেই!—আরাবল্লীর পাহাড়ে উঠে আমাদের গাড়ীর চাকা পিছলে ঘোড়াসুদ্ধ যখন হটে আসতে লাগল, সে বিপদের মুহূর্তে শীতলাই লাফিয়ে পড়ে চার পাঁচ মণ ভারী একখানা পাথর ঠেলে এনে চাকার মুখ আট্‌কে দিল। গায়ের জোরেও সে কোনো পুরুষের চেয়ে কম নয়! এই ত, সতেরো আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সে কোঁচাকাছা দিয়ে কাপড় পরে পাঞ্জাবী উড়ুনী গায়ে চড়িয়ে বেড়াত। সে যে মেয়েছেলে এ কথা তার মনেই থাকত না! এখনও মাঝে মাঝে ভুলে যায়।

—এ কেমন ক'রে হয় মা?

—কেমন ক'রে জানব, বল মা। ভগবানের সামান্য ভুলটুকু লুকোবার অনেক চেষ্টাই সে করেছিল। শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি, আলো—কোনো পুরুষের চেয়ে তার কম ছিল না।

দু'ধারি দোকান-পসার দেখতে দেখতে এসে দুজনে মন্দিরের পথে পড়ল। মা বললেন—ভাল শালগ্রাম খুঁজছি, দেখি যদি কোথাও পাই।

—কি হবে মা?

—প্রতিষ্ঠা করব যে। সেখানে ত শালগ্রাম নেই!

বিহারের কোনো একটি প্রসিদ্ধ স্থানে মা'র প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রমের গল্প সুলতা ইতিমধ্যেই শুনেছিল। অনাথা মেয়েরা সেখানে আশ্রয় পায়; লেখাপড়া সুঁচ-সুতোর কাজ ইত্যাদি নানা শিল্পকর্ম শেখে। আশ্রমের অর্থ সমাগম নিতান্ত মন্দ নয়। মেয়েরা বেশ ভালই থাকে।

মা বললেন—কাশী ত এই জন্যেই আরো এসেছিলাম। ফিরে যাবার মুখে গোটাকতক জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাব এই ছিল ইচ্ছে!

বড় বড় ব্যাকুল চক্ষু তুলে সুলতা বলল—আপনি চলে যাবেন?

পাগলী, তা কান্না এল কেন? ছি, রাস্তায় চলতে চলতে—আমি কি আর এখানে থাকতে এসেছি মা, ওদিক ফেলে ... আমার চলবে না লক্ষ্মী—অনেক মেয়ে যে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

মন্দিরে এক জায়গায় তাকে বসিয়ে সন্ন্যাসিনী ঠাকুনে গেছেন। পূজা সেরে আসতে যান। সুলতা বসেই থাকে। ত লাকিন।

চিত্র-বিচিত্রিত লাল পাথরের প্রকাণ্ড মন্দির। নরনারীর ভিড়ের যাতায়াত সারাদিন আর কামাই নেই। সাধু-সন্ন্যাসী কোথাও ধ্যানস্থ বসেছে, ব্রহ্মচারী ছাত্ররা গায়ে-মাথায় চন্দন মেখে বেদ-গীতা পাঠ করতে বসে গেছে। ফুলে পাতায় গঙ্গাজলে ধূপ-ধুনোয় ঘন্টার শব্দে মন্ত্রোচ্চারণে মন্দিরের মধ্যে একটি বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নানা বর্ণের নানা জাতির মেয়ে পুরুষের ভিড়ে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

সুলতা বসেই রইল। ডানদিকে একটা পাঁচিলের গায়ে প্রকাণ্ড একটি অশথ গাছের শাখা ঝুলে পড়েছে। গাছের সেই ঘন ডালপালার আড়ালে পাখীর সভার কলরব চলছে। মন্দিরের কার্নিসের মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়ে উড়ে বসছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে দল বেঁধে ভিখারীর দল বসে গেছে। একটানা এই জীবন-স্রোতের মাঝখানে সুলতা আর থই পায় না।

গাছের ভিতর দিয়ে সড়সড়ে হাওয়া মর্মর শব্দে বয়ে যাচ্ছিল, সমস্ত কোলাহলের আড়ালে একটি ঘুঘুপাখী থেকে থেকে ডেকে উঠছে—এই ঘুঘুর ডাক শুনলে সুলতার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। সত্যি কথা বলতে কি, তার জীবনে একটি অবসাদ ঘনিয়ে এসেছিল। বহু পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছে, বহু কষ্টই সে পেয়েছে! অপমানের দুর্বহ বোঝা, কলঙ্কের দুরপনেয় কালিমা, দারিদ্র্যের কশাঘাত, নিয়তির অত্যাচার,—মুখ বুঝেই তাকে সইতে হয়েছে! এত বড় এই পৃথিবীতে এতটুকু আশ্রয় শুধু সে চেয়েছিল। শান্তি-সুনিবিড় একখানি কুটীর, একটুখানি আলো-বাতাস, নিশ্চিন্ত একটি বিশ্রাম, প্রিয়তম একটি মানুষ,—বেদনা-জর্জরিত তার ক্ষুধিত আত্মা শুধু এইটুকুই কামনা করেছিল। বাল্যজীবনই যে তার ছিল ভাল! ছোট্ট একখানি গ্রাম, সরু একটি নদী, একখানি ধানক্ষেত, একটুখানি জঙ্গল,—সে স্বপ্ন তার গেল কোথায়? বাল্যজীবন যে তার সব চেয়ে বড় সম্পদ!

এ কথা মিথ্যা নয় যে সুলতা বিশ্রাম চায়। এ ...ছে বিশ্রাম চাওয়া ছাড়া তার আর কোনো দাবিই নেই। ... কাছে সে নির্বাসন-শাস্তি পেয়েছে, জনসমাজ তাকে আর চায় ... ধর্মের কাছে, নীতির কাছে, সুরুচির কাছে তার কোনো ঠাঁই আর নেই,—সে আজ বাতিল হয়ে গেছে।

—চল মা, এসো—আহা, অনেক দেরি হয়ে গেল!

সুলতার চমক ভাঙল, বুকটা তখনও তার ধক্ ধক্ করছে! কে যেন এতক্ষণ তাকে জলের মধ্যে হাত-পা বেঁধে ডুবিয়ে রেখেছিল! সন্ন্যাসিনী তার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন—কি ভাবছিলে? আহা মা—

একটুখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে সুলতা কি যেন বলতে গেল কিন্তু মুখের কথা তার মুখেই রইল!

স্যান্নাসিনী একবার তার মুখের দিকে তাকালেন। সুলতার মুখশ্রী বার বার দেখতে তাঁর কেমন যেন ভাল লাগে। কালো চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতে গেলে তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি যে সন্ন্যাসিনী, তিনি যে গৃহহীনা, রূপ-যৌবন-দেহ-ভালবাসা চিরদিনের জন্য যে তাঁকে ভুলে যেতে হয়েছে এ কথা তিনি ভুলে যান। নারী হয়ে নারীর রূপ তাঁকে অভিভূত ক'রে তোলে!

আর কিছু না বলে সুমুখের দিকে পা বাড়িয়ে তিনি চলতে সুরু করেন। সুলতা আবার যখন তাঁর পিছু পিছু আসে, তাঁর ভয় করে! এই রূপবতী নারীটি গোপনে অসমাপ্ত ভোগের পিপাসা ও ক্ষুধিত জীবনের ঈঙ্গিত নিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাঁর চোখের উপর থাকবে? এই অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী নারীটির ওপর সন্ন্যাসের প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি ত তাঁর নেই! দেবতার নির্মাল্য দিয়ে দেবতার পূজা ত চলে না।

বাসায় পৌঁছতে সেদিন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল!

শীতলা এল, মা'র পায়ের ওপর প্রণাম ক'রে বলল—পূজো কি আজ মন্দিরেই সেরে এলেন?

মা বললেন—জপটা শুধু বাকি আছে।—ব'লে চলে গেলেন।

শীতলা ও সুলতা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগিল। জপ ত বাকি থাকার কথা নয়। মা'র এই অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার কারণ তাদের দুজনের কাছে সমানই রহস্যময় হয়ে রইল। মাকে এতটুকু আন্‌মনা হতে দেখলে শীতলার চক্ষু অন্ধকার হয়ে আসে।

দুজনের মুখে অনেকক্ষণ ধরেই কথা ফুটল না। শীতলাকে নিঃশব্দে দেওয়ালের দিকে ফিরে থাকতে দেখে মৃদুকণ্ঠে সুলতা বলল—দিদি?

শীতলা চকিত হয়ে মুখ ফিরাল। বলল—চুপ কর ভাই, প্রশ্ন করিসনে, অনেক কথা আছে যার উত্তর দিতে গেলে ভয় করে।—তারপর মা যে-পথে চলে গেলেন, সেই দিকে তাকিয়ে শুধু বলল—এমন ওঁর প্রায়ই হয়; মানুষ ত বটে!

এবং আর সে দাঁড়াল না, কোনোমতে মুখ লুকিয়ে সেখান থেকে সরে গেল!

সুলতা আজকাল অনেক কথাই বুঝতে পারে, কিন্তু শীতলার এই আকস্মিক পরিবর্তনটাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। সুলতা যখন তার ঘরে গিয়ে ঢুকল, শীতলা তখন নিজের মনে পাগলের মত মৃদু মৃদু হাসছে। সুলতার কল্পনা আর কতদূরই-বা অগ্রসর হতে পারে! জলচৌকির পাশে সে চুপ ক'রে গিয়ে বসল।

শীতলা মুখ ফিরাল। মুখ টিপে হেসে বলল—ভাবচিস বোধ হয়, এ আবার কি!—কেমন? এরা ত বেশ ছিল, গেরুয়া-পরা দুটো মেয়ে দিব্যি ধর্মে কর্মে মন দিয়ে পূজো-আশ্রা ক'রে দিন কাটাচ্ছিল। এদের গায়ে আবার কোন্‌দিকের বাতাস বয়! এই কথাই ভাবচিস, না রে?

সুলতা করুণ মুখখানি নেড়ে জানাল, এই কথাই সে ভাবছে!

—এমনিই! শীতলা একবার হাসল। হেসে বলল—জীবনটা কোনো বাঁধন সইতে পারে না। গেরুয়ারও না, বেনারসী শাড়ীরও

পশে ...কে চলনসহ ক'রে মানাবার জন্য কত চাবুকই না মারতে চাকা ি ভাই, তা আর কি বলব। আফিঙ খাইয়ে কতবার তাকে মুহূর্তো করলাম, আত্মহত্যার কত সুযোগই তাকে দিলাম, কিন্তু হায়রে ঠেনু—পাওনা-গণ্ডা সে ছাড়বে কেন বলত? "জিব বার ক'রে অনেক চোখের জলই যে সে চেটে খেয়েছে! সাপের বিষ নেই বললেই কি সে অমনি ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাবে?

নিজের মনেই শীতলা থেমে থেমে হাসতে লাগল। কথা যার সঙ্গে তার চলছিল সে যেন সুলতা নয়, অন্য কেউ। শীতলা তাকে বেশ ক'রেই জানে!

শীতলা চট্ ক'রে আবার বলল—আচ্ছা, মাকে দেখে তোর কি মনে হয় বল দেখি ভাই?

সুলতা আগ্রহ কণ্ঠে বলল—কি ক'রে জানব দিদি?

—তা বটে, আমিই কি জানি যে তোকে বলব? মাথা রুক্ষ কেন? আজ বুঝি গঙ্গাস্নান হয়নি?

—না।

তবে যা ভাই তাড়াতাড়ি, দেখিস যেন ডুব দিতে গিয়ে মনের দুঃখে ডুব দিসনে। তবে শুধু তোর রূপটাকে যদি মা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসতে পারতিস ত মায়ের মন আবার গীতায় বসে যেত।—ব'লে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের মনেই শীতলা আবার হাসতে সুরু ক'রে দিল।

সুলতা একটুখানি দাঁড়াল, কিছুই সে বুঝতে পারল না, তারপর গামছাখানি কাঁধে ফেলে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আঃ—রাস্তায় নেমে প্রাণটা যেন তার বাঁচল! ঘরের মধ্যে হাওয়াটা এতক্ষণ যেন ঘুলিয়ে উঠছিল। এবার মুক্তি! মুক্তিই সে চায়।

সংস্কার থেকে মুক্তি, বন্ধন থেকে মুক্তি, দেবতার পূজা-উপকরণের জন্য সে এই পৃথিবীতে এসেছিল কিন্তু মানুষ তাকে সে-মুক্তি দিল না।

রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের ছায়া পথে ঘাটে নেমে এসেছে।

খানিকক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বাতাসটি বেশ স্নিগ্ধ। ইস্! একবার দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ ক'রে একটি নিশ্বাস টেনে নিল। একাকিন সে আজ বহুকাল পরে পথ চলতে পেরেছে—এই অল্প সময়ের আনন্দটুকু সে যে কেমন ক'রে উপভোগ ক'রে নেবে, তাই সে ভাবতে লাগল। মনে হল, সঙ্গীও ত তার কেউ নেই! সুমুখে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, কাছে দূরে—কই, সঙ্গীর ত কোনো চিহ্নই কোনোদিন ছিল না! চারিদিক থেকে বরং জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্র তাকে পথের ইঙ্গিত ক'রে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আচ্ছা, বেশ তাই হোক—এঁকে-বেঁকে টাল খেয়ে হেলে দুলে সে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল।

কিছুদূর এসে একটা গলির বাঁক ফিরতেই প্রকাণ্ড একটা অশথ গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার দৃশ্য তার চোখে পড়ল। এই গঙ্গার দিকে তাকালেই উপেনকে তার মনে পড়ে। আশ্চর্য উপেন। কপালে হাত তুলে সুলতা তাকে একটা প্রণামই জানিয়ে দিল! উপেন তার ধ্যানলোকের মানুষ! উপেন তার অনেকখানি।

হ্যাঁ, জীবনে ভালবাসাকে সে পিঞ্জরাবদ্ধ করেনি! মুক্ত বিহঙ্গের মত তার সে প্রেম উড়ে উড়ে বহু জায়গায় বসে বহু গান গেয়ে বহু মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছে। নিঃসঙ্কোচ ও নির্বিকার আনন্দে সুলতা সকলের ভালবাসাকে গ্রহণ করেছে! বিবাহের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কেউ তার জীবনকে আবদ্ধ করেনি, প্রেমের কথা সেই ত সকলের চেয়ে বেশী জানে! নরনারীর সামান্য দেহের টানে প্রেম ত তার বাঁধা পড়েনি!

গঙ্গার ধারে সে এসে দাঁড়াল। ওপারে বহুদূর পর্যন্ত প্রান্তর ছুটে গেছে, বাঁ-দিকে দূরে খানিকটা জঙ্গলের রেখা, তারই কোলে মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্রের সবুজ তালি দেওয়া মাঠ,—ওখানে হয়ত ছোট ছোট বনবিহঙ্গের অক্লান্ত কূজন-ধ্বনি চলছে। এই জীবনের নেশায় সুলতার চোখ দুটি মোহাবিষ্ট হয়ে এল। পরাজয়ের বেদনায়, অপমানের লজ্জায় চিরদিনই সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে কিন্তু সব চেয়ে বড় আনন্দই

পর্শে সে আবিষ্কার ক'রে বসে রয়েছে। পৃথিবী জয় সে করেনি, কিন্তু চান্ডালবাসার সহজ পথটি যে তার একেবারে করতলগত!

ঘাটে ভিড় নেই, স্নান সেরে প্রায় সবাই একে একে চলে গেছে। কয়েকটা উলঙ্গ হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়ে সাঁতার দেবার নামে জলের ওপর মাতামাতি করছিল। ওপারের বালুচড়ার ওপর রৌদ্রালোক জ্বল্ জ্বল্ করছে। যে বিশাল অশথ গাছটি ঘাটের ধারে প্রায় ঝুঁকে পড়েছে, তারই ছায়া-ঝিলিমিলির মধ্যে মধ্যাহ্ন রৌদ্রের গান একটি উদাস একঘেয়ে সুরে মর্মর-ধ্বনি তুলেছিল। সুলতার সমস্ত মন মুগ্ধ হয়ে সেই ধ্বনির প্রতি কান খাড়া ক'রে রইল।

পাশের নির্জন ঘাটে 'ছত্রির' তলায় এক সাধু আস্তানা করেছিল। সুমুখেই ধুনি জ্বলছে। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীটি প্রায় নগ্ন দেহে আভাঙ ক'রে বিভূতি মেখে বসে রয়েছে; তারই একটি অল্পবয়সী শিষ্য এইমাত্র ঘাট থেকে জল তুলে আনল। সুলতা সেই দিকে তাকিয়ে ছিল, এমন সময় একটি বৃদ্ধা সধবার পিছনে পিছনে একটি সুন্দর যুবক, একটি সুন্দরী যুবতী ও একটি ফুটফুটে ছোট মেয়ে—খুব সম্ভব যুবকটির স্ত্রী ও কন্যা—সবাই মিলে এসে জলের ধারে দাঁড়াল। বৃদ্ধাটি অঞ্জলি ক'রে জল তুলে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও বালিকাটির মাথায় স্পর্শ করালেন! স্বামী-স্ত্রী হেঁট হয়ে তার পায়ে প্রণাম করল, বৃদ্ধা চোখ বুজে আশীর্বাদ করলেন! বোধ করি বিদেশের যাত্রী হবে! সবাই মিলে আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। যাবার সময় সুলতার দিকে ফিরে কি যেন তারা বলাবলি করল!

ছোটখাটো জীবনের এই বিচিত্র সুরগুলি সুলতার চিরদিনই ভাল লাগে! স্বামী-স্ত্রীর এই আসা ও চলে যাওয়াটুকু যে-আনন্দ তাকে দিয়ে গেল, সুলতা তার জন্য চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকবে! দুটি নরনারীর মিলিত জীবনের মাধুর্য তার কাছে অনেক বড়!

নৌকায় চড়ে একদল যাত্রী রামনগরের দিকে চলেছে। এই নির্জন মধ্যাহ্নে একাকী নদীগর্ভে চলতে চলতে একজন হিন্দুস্থানী ভজনের সুরে দেহতত্ত্বের গান ধরেছে। অদূরে একটি হিন্দুস্থানী

মেঝে সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে কাচতে হাত থামিয়ে রইল। সেখানি ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যাবার পর আর একখানি নৌকা কাছে এল। তারাও যাত্রী। বিদেশিনী একদল মেয়ে সেজেগুজে কদম্বের গোছা হাতে নিয়ে সুমধুর কণ্ঠে কাজরীর গান গাইতে সুরু করেছে। একটি লোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। আকাশের পূর্ব প্রান্তে তখন একখানা কালো মেঘ দেখা দিয়েছে।

রোদের তাতে সুলতার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছিল। এবার সে উঠে দাঁড়াল। কাজরীর গান তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

ঘাট ছেড়ে সে পাড়ের ওপর দিয়ে চলতে লাগল ওঘাটের দিকে। এই সুন্দর শহরের নদীতীরবর্তী সমস্ত ঘাটগুলিতে বেড়িয়ে বেড়াতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল ; ওঘাটে উঠে সন্ন্যাসীর 'ছত্রির' কাছে সে এগিয়ে গেল, শিষ্যটি একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল। সুলতা অতি সঙ্কোচে এবং সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সাধুর সুমুখে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়াল। তার পা কাঁপছিল!

অনেকক্ষণ পরে সাধু মুখ তুললেন। চোখে তার কোনো কৌতূহল নেই। একবার তাকিয়ে আবার তিনি যেদিকে চেয়ে ছিলেন ঠিক সেই দিকেই মুখ ফিরিয়ে রইলেন। সুলতার গেরুয়া তাঁর দৃষ্টি একেবারেই আকর্ষণ করল না!

হেঁট হয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়ে সুলতা তাঁর উদ্দেশ্যে একটি একান্ত প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। আকাশ তখন চারিদিকে মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে এসেছে!

ঘাটে এসে আবার সে চুপ ক'রে দাঁড়াল। নদীর জল ছলছল করছে। মেঘের ছায়া পড়েছে জলের ওপর! আকাশ যে একেবারে আকুল হয়ে এল! কি হবে? নদী, বালুচড়া, এপার ওপার, সমস্ত যে একাকার হয়ে গেল—কেমন ক'রে তবে আজ সে—?

এ যে মরণের রূপ! মৃত্যু কি আজ চারিদিক থেকে তাকে এমনি ক'রে বেষ্টন করবে?—না, সুলতা অন্যায় করেনি, অধর্মকে

প্রশ্রয় দেয়নি, দুঃখ-দারিদ্র্যকে স্বীকার করেনি, বেদনা অশান্তিকে আমল দেয়নি,—আনন্দ ছিল তার হৃদয়ের দুয়ারে চিরদিন বাঁধা।

সে যে পাপিষ্ঠা, একথা কে বলল? জীবন ত ছিল তার কাছে তীর্থক্ষেত্র! জ্ঞানী গুণী, ভদ্র সম্ভ্রান্ত, সাধু সজ্জন, নর নারী, সবাই মিলে তার মন্দিরে পদচিহ্ন রেখে গেছে! মৃত্যু যদি আজ তাকে হরণ করে তবে কি তার মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে?

না,—বরং যে-ধরিত্রী চিরদিন তাকে আনন্দ দিয়ে এসেছে, তার ঋণ শোধ করতে তার কুণ্ঠা নেই! সে ত মাটিরই মেয়ে! ফুল হয়ে ঝরে পড়ে মৃত্তিকার কাছে আত্মাঞ্জলি দেওয়াই ত তার জীবনের মহৎ পরিণাম।

—বলি ওরে আবাগী?

চমক ভাঙতেই সুলতা ঘাড় ফেরাল। হেসে লুটিয়ে চঞ্চল হয়ে এসে শীতলা তাকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। বলল—সাহস হল না? পারলিনে ডুবতে? জীবনে দু' একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলিনে?

সুলতা একবার বলতে গেল—দিদি—

—চুপ! শীতলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—একেই ত জড়িয়ে ধরেছি, দিদি বললে এবার চুমুও খেতে হবে! আয়, নাইয়ে দিই!

শীতলা তাকে টেনে জলের মধ্যে নিয়ে গেল। বলল—জলের ভেতর লুকিয়ে তোকে আদর করি আয়,—মা ত আর এখানে নেই যে মোহ-মুক্তির স্বপ্ন দেখতে হবে!

দুজনে পরমানন্দে স্নান করতে লাগল। শীতলা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বলল—এত দেরি, ভাবলাম বুঝি মেয়েটা কূল ছেড়ে কুলত্যাগ ক'রে গেল। ও হরি, মরবার এমন সুযোগ পেয়েও হারালি? বেঁচে থাকার সাহস দেখছি তোর ভয়ানক!

এবার সুলতা ফিক্ ক'রে হেসে ফেলল।

শীতলা বলল—আমি সাঁতার জানি, ফিরে আসতে পারব, কিন্তু তোকে যদি ধরে ডুবিয়ে দিই সুলু?

সুলতা বোকার মত বলল—তাই ভাবছিলাম দিদি।

দিদি বলল—থাকগে, যাবার সময় তোকে ডুবিয়ে আর পাপ কুড়িয়ে নিয়ে যাই কেন!

—যাবে? তোমরা চলে যাবে দিদি?—সুলতার গলা কেঁপে উঠল।

—নিশ্চয়ই। ছটা রিপুকে আমরা যে মা বলে ত্যাগ করেছি রে!

—কবে যাবে?

—আর চব্বিশ ঘণ্টা বাদে। মায়ের গীতাপাঠ বন্ধ হয়েছে, পুজো-আশ্রা মাথায় উঠেছে, গেরুয়ার ওপর এসেছে অভিমান। তোকে এড়িয়ে না গেলে মা'র যে আর রক্ষে নেই ভাই।

শীতলার ভিজে আঁচলটা চেপে ধরে সুলতার চোখে জল এল। বলল—আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না দিদি। তুমি যেখানে যাবে আমিও তোমার সঙ্গে—

শীতলা হাসতে হাসতে বলল—যাব শ্বশুরবাড়ী, তুই গিয়ে থাকবি সেখানে সতীন হয়ে?

সুলতা আঁচল চেপে রইল।

শীতলা বলল—তোর প্রেম দেখছি স্ত্রী-পুরুষ বাছে না। ওরে অভাগী, কিছুই ত আমি পাইনি এই তিরিশ বছর পর্যন্ত, আঁচল ধরে আমার মুক্তির পথটাও কি বন্ধ করবি তুই?

সুলতা বলল—চাইনে তোমার মুক্তি। আমি জানি তুমি কিছুই চাও না, সব তুমি ত্যাগ করেছ।

চিবুকটি তার নেড়ে দিয়ে শীতলা হেসে বলল—এমন রূপ তোর, আমি পুরুষ হলেই যে ভাল হ'ত। আয়—দেখি কি করতে পারি।

ভিজে গেরুয়া কাপড় টেনে টেনে গায়ে জড়িয়ে ছুটি সুন্দরী মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ঝর ঝর ক'রে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

॥ ১১ ॥

শীর্ণকায়া পার্বত্য নদীটি এঁকেবেঁকে ঘুরে ফিরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের পথের দিকে মিলিয়ে গেছে। বর্ষায় ঢল্ নামে, নুড়ির ফাঁক দিয়ে ঝির্ ঝির্ ক'রে জলস্রোত আসে, কুল্ কুল্ ক'রে শব্দ হয়— নদীটি বড় আদুরে।

আদুরে নদীর তীরে গাছের ছায়ায় ভর-দুপুরের রোদে পাখীর জটলা বসে। কচিৎ এক আধটা গরুও দেখা যায়—মুখ ডুবিয়ে জল খেতে আসে। কাঁচের মত পরিষ্কার এবং ধারাল জল। জলের ধারে শ্যাওলার ওপর পতঙ্গ ঘুরে ঘুরে যায়।

ওই উদাসিনী নিভৃত নদীটিকে নিয়েই যত কিছু।

গ্রাম ত নয়—ছোট্ট পাহাড়ী বসতি! বসতির মধ্যে তিন চারখানি কোঠা, দুটি খড়ো চালা, একটি মন্দির, তারই পাশে ফুলের বাগান আর ডান দিকে একখণ্ড জমিতে শাক-সব্জীর আবাদ।

আবাদ করেছে মেয়েরাই! আঁটসাঁট ক'রে কোমরে কাপড় বেঁধে চুলের গোছা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে হেসে কপালের ঘাম মুছে মেয়েরাই মাটি খোঁড়ে। আর ওই আশ্রমের চারদিকটা রাঙ্চিতের বেড়া দিয়ে ঘিরল—সেও ত মেয়েরা। মেয়েদের নিয়েই আশ্রম!

আশ্রমটির কাছাকাছি কোথাও লোকালয় নেই। তিনদিকে উঁচু পাহাড় আর একদিকে সুদূর প্রসারিত দিগন্ত,—আদুরে নদীর বাঁক তারই পরপারে জবাফুলের মত রাঙা সূর্য ধীরে ধীরে মাঠের নীচে নেমে যায়।

দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের কোলে আর-একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চলছে।

—নাম হবে আলোকনাথ, শীতলাদি নাম রাখতে পারে চমৎকার! শিবের দিকে মুখ ক'রে রোজ সূয্যি উঠবে।

মেয়েরা বলে।

• বলে আরো অনেক কথাই,—জঙ্গল যখন কাটা হল, জীবজন্তুর তখন অভাব ছিল না,—নাথের পাহাড়ের ছোট্ট ঝরনাটিতে কবে একটা নেক্‌ড়ে বাঘ জল খেতে এসেছিল তারই গল্প বলতে বলতে প্রৌঢ়া স্নেহময়ী হরর মা সবার দিকে হাসি মুখে তাকান।

পাঁচ বছরে কত বদলই হল ভাই—মা এলেন শুধু হাতে, রাঙা পেড়ে শাড়ী পরে নদীর ধারে বসে চোখ বুজে ছিলেন—কেউ সঙ্গে ছিল না! পুণ্যবতীর পুজো মিথ্যে হয় না,—ভগবান দিলেন মাইতি-গিন্নীকে জুটিয়ে! মাইতি-গিন্নীর দেখা না পেলে মাকে অনেক বেগ পেতে হ'ত। বন কেটে আশ্রম করা, তায় আবার মেয়েমানুষ—না দেখলে লোকে বিশ্বাসই করত না!

পুরানো গল্প গুছিয়ে বলতে শুধু হরর মা-ই পারেন।

দূরে একটি মেয়ে একা নদীর পথে চলছিল, তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কানা-বাসন্তী বলল—বাবারে বাবা, ওই দেখো রমা-দি—রাজকুমারী চলল নদীর ধারে গিয়ে বসতে···সত্যি বলছি, এমন গম্ভীর মেয়ে কোথাও দেখিনি কিন্তু, উঃ—ও রকম একলা-একলা থাকলে আমরা কিন্তু পাগল হয়ে যেতাম! না ভাই মালিনী?

মালিনী কালো! নতমস্তকে ঘাড় হেঁট ক'রে শুধু বলল—হুঁ।

হরর মা বললেন—ও বরাবরই অমনি! কথা যত কম বলে ওর মন তত ভাল থাকে! ভাইটা যখন রেখে চলে গেল, কাল নিয়ে যাব বলে আর এলই না,—রাজকুমারী এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌ল না ভাই। সহোদর ভাইয়ের ব্যবহারে অবাক হয়ে চিরদিনের মতন চুপ ক'রে গেল! রাজকুমারী যতদিন বাঁচবে মানুষকে সে আর ভাল চোখে দেখবে না!

কথাগুলির মধ্যে ঠিক যে সুরটি বেজে ওঠে, মেয়েরা তাতে একে-বারে অভ্যস্ত নয়।

কাজ করে মেয়েরাই। রাঁধে, বাসন ধোয়, জল তোলে,—প্রায় তিন ক্রোশ মাঠ ভেঙে দূরের ষ্টেশন থেকে গরুর গাড়ী ক'রে জিনিস-পত্র আনায়,—তাও মেয়েরা! মেয়েদেরই রাজ-রাজত্ব!

স্বাধীনতা আছে সবারই। অল্প জায়গার মধ্যে জটলা পাকিয়ে মাথা গুঁজে থাকবার প্রয়োজন হয় না—দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাঝখানে খোলা হাওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে দিন কাটে তাদের চমৎকার!

বিজয়া খুব স্পষ্টবক্তা। ঝাঁজ আছে। বলে—লোভ কি সামলানো যায়? পালিয়ে এসে এমন থাকবার জায়গা খুব কমই আছে। গোড়ায় আমি ত একেবারে অন্ধকার দেখেছিলাম……

কানা-বাসন্তী তার গা ঠেলে থামাতে যায়। তীব্রকণ্ঠে বিজয়া বলে—কি হবে লুকিয়ে? অন্যায় করলাম না অথচ বদনামের ভাগী হলাম, এ রাগ কি আমার সহজে যাবে তুই মনে করিস? তবু বদনাম সইতে পারি কিন্তু অপমান—? অমন শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করাই ভাল!

ওপাশে অনিলার মুখ চোখ রাঙা হয়ে ওঠে। হরর মা'র দিকে তাকিয়ে সলজ্জ একটুখানি হেসে উঠে চলে যায়। বিজয়া-দির মুখে কিছু আটকায় না! ছিঃ!

অবসর মত এমনি আলোচনা তাদের হয়ই। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু বয়সের পার্থক্য-বিচার সব সময় থাকে না, কেউ যে কারো চেয়ে খাটো নয় সেটা এখানে না এলে এমন সহজে আর কিছুতেই বোঝা যায় না! এখানকার মেয়েদের কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই, আচার এবং নীতির শাসন ত নেইই।

কানা-বসন্তী এক পতিতার মেয়ে। কিন্তু তাকে নইলে কারো চলে না। তা ছাড়া মায়ের পূজোর ফুল তোলবার ভার তারই ওপর। কুমারী অবস্থায় মলিনার পদস্খলন হয়েছিল—এখানে না এসে তার অন্য উপায় ছিল না! মলিনা শীতলার একেবারে ডান হাত। চন্দ্রা অল্প বয়স থেকেই স্বামী-পরিত্যক্তা, ত্যাগ করবার কারণ আজ অবধি সে নিজেও খুঁজে পেল না! আর বিজয়ার কথা ত বিজয়া নিজেই বলে! স্বামীর সহোদর ভাই—দেবরের কাপুরুষতাকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে ফলে হয়েছিল উল্টো—লোকে ভুল বুঝে বদনামের কলঙ্কে তাকে আবৃত ক'রে দিয়েছে। বাপের বাড়ীর পথও বন্ধ হয়ে গেল।

। তা যাক্—বিজয়া ও সব কিছুই গ্রাহ্য করে না।

গৌরী আসে, পুষ্প আসে, মেনু আসে, মাইতি-গিন্নীর ঘাড় কাঁপে তবু আসে পা পা ক'রে। দন্তহীন মুখগহ্বর হাসিতে ভর্তি ক'রে এসে অনর্গল অবোধ্য ভাষায় কথা বলে যায়। মেয়েরা সবাই তাকে নিয়ে আমোদ করে।

দূরের গ্রাম থেকে চাষীর ছেলে-মেয়েরা পড়তে আসে। আসে দুপুরবেলা, আবার বিকালবেলায় ছুটি। এ ব্যবস্থাটি করতে শীতলাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কলরব করতে করতে মাঠ পার হয়ে যখন তারা আসে, অনেক দূর থেকেই তাদের সোরগোল শোনা যায়। শীতলার কান দুটি অমনি উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

এক পাল ছেলেমেয়ে। বড় বড় মেয়েরা তাদের ভাগ ক'রে নিয়ে পড়াতে বসে। শাসনের সঙ্গে স্নেহ—পড়াশুনো তারা মন দিয়েই করে। বিজয়া কিন্তু ভারি কড়া মাষ্টার।

শেষ-বর্ষার আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল। মেঘ হাল্কা হয়ে গেছে। সাদা সাদা ছোট ছোট মেঘগুলি নদীর জলের ওপর ছায়া ফেলে যায়। নীল আকাশের সঙ্গে সবুজ মাঠ কোলাকুলি করে। কাশের বন নেই, কিন্তু শিউলি ফুলের মুখচোরা গন্ধ চারিদিকে ভুর ভুর করে। মেঘের গর্জনের সঙ্গে মাঝে মাঝে এক-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যায়, —আবার যেমন-কে-তেমন, সাদা মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ রোদের আলোয় ঝল্ ঝল্ করতে থাকে।

সমস্ত দিনমানের একটি কর্মহীন অলস মন্থরতা! দূরে শস্যশ্যামল মাঠের আধ-পাকা ধানের গন্ধ বাতাসে ভেসে ভেসে আসে। জানলার পাশে ডালিমের ঝোপে মৌমাছির অশ্রান্ত গুন্‌গুন্ লেগে থাকে। সুমুখে চণ্ডীর পাহাড়ের গায়ে টিয়াপাখীর ঝাঁক্ চরে বেড়ায়। পাহাড়ের নীচেই জামের বনে ক্লান্ত ঘুঘুর কণ্ঠ শোনা যায়

—কেমন্ লাগছে রে?

শীতলার প্রশ্নে সুলতা হঠাৎ থতিয়ে যায়।—

নারিকেল-পাতায় ছাওয়া ঘরখানি। ঘর ঠিক বলা চলে না, ভিতরে প্রকাণ্ড একটা আড়ৎ। বড় বড় দুটো ধানের গোলা, তেল-ঘিয়ের কয়েকটা পিপে, কেরোসিনের কানেস্তারা, আলকাতরার হাঁড়ি, রাজ-মিস্ত্রীর সরঞ্জাম, পাট-তুলোর দুটো বস্তা, একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন, দেয়ালের এক কোণে কতকগুলো কাঠ্‌রা এবং কিছু দড়ি, এপাশে স্তূপাকারে তরী-তরকারি, ফল-ফুল, চন্দন কাঠ, কুশাসন,— এবং আরো অসংখ্য জিনিসপত্র! আড়াআড়ি খান-তিনেক কাঠের চৌকির ওপর গোটা-দশেক সেলাইয়ের কল! ঘরের মাঝামাঝি দু' তিনটে মাচা, তার ওপর বিছানা—একটাতে বোধ করি মিষ্টি আছে, বোল্‌তা ঘুর ঘুর করছে! চালের বাতায় হরেক রকমের প্রয়োজনীয় ছোট ছোট জিনিসপত্র গোঁজা! তেল, ফিনাইল, চন্দন, ঝাল-মসলা ও ফলমূল একত্রে মিশে একটি বিচিত্র গন্ধে এই প্রকাণ্ড আড়ৎ ঘরটি দিনরাত ভর্‌ ভর্‌ করছে!

এইখানেই একপাশে একটি জান্‌লার সুমুখে থাকে এরা দুজন। শীতলা এই ঘরের মালিক!

শীতলা বলল—চুপ ক'রে আছিস যে? মাঠ দেখলে মন হু হু করে নাকি?

—কই, না ত!

শীতলা বলল—আমাকে ত ছাড়লিনে। কিন্তু আমি তোকে খুব ভাল ঘরেই রাখতে পারতাম। বাপরে, তুই আমার স্বামী হলেও হয়েছিল আর কি, এতদিনে হাঁপিয়ে উঠতাম! ভাগ্যিস!

সুলতা বোধ হয় একটু হাসবারই চেষ্টা করল।

অনেক ঘরোয়া কথাই শীতলা আজকাল তাকে বলে।

—আচ্ছা, মা কি তোকে কিছু বলেছেন?

—আমাকে? না ত শীতলা-দি?

—হুঁ! ব'লে শীতলা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর হঠাৎ নিজের মনেই সে বলে ওঠে—কি জানি বাপু, আমি অনেক জানি

কিন্তু এইটে ঠিক বুঝতে পারিনে। রূপের দিকে তাকালে মানুষের মনে যে কাঁটা ফোটে, এ কথা কে জানত বল দেখি ভাই?

সুলতা অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়।

—কই মা ত এমন ছিলেন না?—অন্তরের গাম্ভীর্যটিকে চেপে রেখে শীতলা মুখে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে বলে—মা আমাদের দেখতে নিতান্ত মন্দ নয় কিন্তু, কি বলিস্?

সুলতা বলে—চমৎকার!

উত্তরটি ছিল একেবারে সুলতার জিহ্বাগ্রে! প্রথমটা শীতলা একবারটি মুখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে তার মাথাটি টেনে নিয়ে গালের ওপর একটি চুম্বন বসিয়ে দেয়। বলে—তোর গায়ে হাত দিলেই নিজেকে মেয়ে বলে আর মনে থাকে না ভাই।

যে-কথাটি সুলতা কিছুদিন থেকেই বলবে বলবে ভাবছিল, সেটি সে বলেই ফেলে—দিদি, মা যদি এমন ক'রে রাগ ক'রে থাকেন তা হলে—

—রাগ নয়, রাগ নয়—একে রাগ বলে না সুলতা! মেয়ে হয়ে ত বুঝিস মেয়েমানুষের এটা কোথায় লুকিয়ে থাকে। ওটাকে সন্ন্যাসের পালিশ দেওয়া যায় না, গেরুয়া দিয়ে ঢেকে রাখা চলে না, গীতার শ্লোক ওটার মুখ বন্ধ করতে পারে না! হিংসেটা হিংসেই, রাগ নয়!

শীতলা উত্তেজনায় উঠে বসেছিল। অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বলল—রূপের প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়াটা মেয়েরা কি সহ্য করতে পারে?

ভীতকণ্ঠে সুলতা বলল—তুমি কি বলছ দিদি? আমার দিকে হলে তুমি কি এখানে টিকতে পারবে?

বয়সের একটি পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য শীতলার মুখে ফুটে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, এ যেন সে নয়! এতদিনের ব্যঙ্গোজ্জ্বল বিদ্রূপাত্মক সহাস্য মাধুর্যময় মুখখানি অকস্মাৎ পাথরের মত কঠিন হয়ে আসে। চোখ দুটি স্পষ্ট, তীব্র, কণ্ঠে এতটুকু জড়তা নেই, অন্যায়কে মেনে নেবার মেয়ে সে যেন নয়। বলে—ঈষৎ একটু সচেষ্ট হেসেই বলে—নিশ্চয়ই! একটা টাকার মধ্যে অন্তত দশ আনা আমার পাওনা, মা একথা খুব

ভাল ক'রেই জানেন। তা ছাড়া যেটা পাব সেটা আদায় করতে আমি যে ইস্পাতের মতন—একথা বুঝতেও আর কারো বাকি নেই ভাই!

কাজললতার অঞ্জন বোধ হয় শীতলার চোখেও লেগেছিল! সন্ধ্যার রূপসী অন্ধকার একটু একটু ঘনিয়ে এসেছে। সারাদিনের একটা মোটামুটি আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নিয়ে শীতলা একটু ব্যস্ত ছিল। সুলতার চোখে তখন অস্তাচলের চূড়ায় সন্ধ্যা-তারাটি জ্বল্ জ্বল্ করছে! কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে শীতলা এক সময় বলল—আজ যে শুক্ল পঞ্চমী, চাঁদের আলো দেখতে তোর না ভাল লাগে?

সুলতা যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, কম্পিত দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল!

শীতলা বলল—রাজকুমারী ছাড়া আজ অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে বসে থাকবে বলতে পারিস? ওই একটি মেয়ে ভাই আমাদের এখানে আছে, সমস্ত জীবন থেকে ওর গল্ গল্ ক'রে শুধু বিষই উঠেছে। আর দেখগে যা অনিলাকে, নদীর ধারে বসে হাওয়ায় চুল উড়িয়ে দিয়ে এতক্ষণ সে হয়ত গান ধরেছে! লিখতে জানলে অনিলাকে নিয়ে কবিতা লিখতাম।

কথাটি বলে শীতলা নিজেই হাসল। বলল—তুই দেখছি ভিড় সইতে পারিসনে, নারে? একজনের কাছে থাকতে পেলে আর-একজনকে তোর মনেই থাকে না! মুখপুড়ি, তুই কি আমার আঁচল ধরেই দিন কাটাবি? যা ওঠ্, পাহাড়ের ধারে খানিক রাত অবধি টহল দিয়ে আয়—যা!

সস্নেহ তিরস্কারটি সুলতাকে চৌকির উপর থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। গায়ে চাদরটা মুড়ি দিয়ে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আবার সে ফিরে এল।

—কিরে, সাপে তাড়া করল নাকি?

সুলতা একবার দরজার দিকে একবার শীতলার দিকে তাকাল! মস্ মস্ ক'রে পায়ের শব্দ যাঁর হচ্ছিল, তিনি ভেতরে এসে ঢুকলেন।

—বাঃরে, দেবদত্ত যে! এমন অসময়ে?

পূর্ণ যৌবন প্রৌঢ়ত্বের দিকে হেলতে আর বোধ হয় দেরি নেই। দোহারা গড়ন, গায়ে ছেঁড়া খাটো খদ্দর, মাথার চুলের মাঝখানে বড় একটা কাটার দাগ।

দেবদত্ত বলল—এ চলবে না, মারভাঙা থেকে যদি আনাতাম, তা হলেও সাতষট্টি টাকার বেশী পড়ত না। ছিয়াত্তর টাকা যে এখানেই ঘিয়ের দর নেবে, এ লোকসান আমরা সইতে পারব না।

শীতলা বলল—তবে কলকাতায় যাও?

—তা ত যেতেই হবে, কি মনে কর তুমি? আর দেখ না বসে বসে—সমস্তই এবার পাইকারী দরে কিনছি!

শীতলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সব তার কানে যায় না।

—আর শোন এক কথা। সুতো কাটা মেয়েরা এত কমিয়ে দিল কেন? দিনরাত কেবলই বুঝি আড্ডা চলছে? একটু ধমকে দিতে পার না? বুনোনের কাজ এবার কিছুই হয়নি। মাটির পুতুলেও ভাল ক'রে রঙ চড়েনি। কাগজের ঠোঙাগুলো সব ফুটো; পুঁথির মালার গেরোগুলো আল্‌গা! পয়সা দিয়ে যারা জিনিস কেনে তারা শুধু একবারই ঠকে। মেয়েদের তুমি একটু সাবধান ক'রে দিও।

মুখের হাসি টিপে গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে শীতলা বলল—নিশ্চয় দেব, এ সব ভারি অন্যায়।

দেবদত্ত পকেটের ভেতর থেকে কতকগুলি কাগজপত্র বার করল। একটি একটি ক'রে সেগুলি গুছিয়ে শীতলার হাতের কাছে ধরে বলল—মেহের কোম্পানীর তিরিশ টাকা জমা ক'রে নাও, আর এই সুতো বিক্রীর রসিদ,—মোটা সুতো, এবার সস্তায় দিতে হয়েছে। দুধের টিন টাকায় ছটার বেশী নামল না,—দুধে নাকি ধোঁয়া গন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেবদত্ত একটির পর একটি হিসাব দিতে লাগল।

শীতলা তারপর জিজ্ঞাসা করল—এলে কখন?

—অনেকক্ষণ?—গৌরী, পুষ্প, বুলু ওরা কেউ ছাড়ে না, বলে, 'চোর চোর' খেলায় বুড়ী হতে হবে! কি আর করি—মাঠের মাঝখানটিতে চুপচাপ বসে রইলাম! ময়দার মত সবাই ঠেসতে লাগল। ফেরবার সময় চাষীদের ছেলেমেয়েগুলো—একটা কাঁধে, একটা মাথায়, একটা আবার হাত ধরে ঝুলতে লাগল। জানই ত ছেলেমেয়েগুলো আমায় পেলে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে!

আলোটা আড়াল ক'রে দেবদত্ত দাঁড়িয়েছিল। তারই পিছন দিকে হঠাৎ আঙুল বাড়িয়ে শীতলা বলল—ওকে দেখেছ?

আত্মবিস্মৃত হয়ে এতক্ষণ দেবদত্ত কথাবার্তা বলছিল, অন্ধকারে আর কেউ যে এমন নিঃশব্দে বসে থাকতে পারে, এ খেয়াল তার ছিল না। চট্ ক'রে থেমে গিয়ে আলোটা ছেড়ে সে পিছন ফিরে তাকাল।

তাকাল সে নিতান্তই উদাসীনভাবে। সপ্রতিভ এবং লাজুক দুটি বড় বড় হতচকিত দৃষ্টির সঙ্গে তার একবার চোখোচোখি হল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে শীতলার দিকে তাকিয়ে দেবদত্ত পুনরায় বলল পাটনার ব্যাঙ্ক বন্ধ, টাকা জমা নিল না! পোষ্টআফিসের হিসেবেই আপাতত রেখে এলাম!

—বেশ করেছ। এখন থাকবে ক'দিন?

—দিন দুই। তারপর একবার গিয়ে আবার শীঘ্রই ফিরে আসব।

দেবদত্ত ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শীতলা বলল—শোন, কথা আছে—বলতে বলতে সে উঠে তার পেছনে পেছনে বাইরে এল স্থূলতার অস্তিত্ব পর্যন্ত দেবদত্ত স্বীকার ক'রে গেল না!

পঞ্চমীর চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে নেমে গেছে। আশ্রমের পিছন দিকের অব্যবহৃত পথটি দিয়ে দুজনে চলতে লাগল। এদিকটায় বিশেষ কেউ আসে না। পথটি এঁকেবেঁকে চিত্রকূটের নীচে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শীতলা হাতটি ধরে বলল—আচ্ছা, দেবদত্ত!

দেবদত্ত মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটুখানি স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল—ও নামে ডাকলে উত্তর দেব না! তোমার দেওয়া নামে চলব, আমার বুঝি নিজের নাম নেই?

আচ্ছা বেশ, না হয় আলোকনাথই হল! আলোকনাথ প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমার নাম যে আমার লুকিয়ে রাখবার ইচ্ছে! তোমার পুজো তাঁকেই দেব!

—লাভ?

—লাভ নেই? সন্ন্যাসিনী সেজে অবৈধ প্রেমটাকে আগে থেকেই প্রকাশ করতে বল?

—তা বটে! দেবদত্ত হাসল! তারপর দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে আবার চলতে লাগল।

চারিদিকে জল। আর মাঠ। খাল বিল সব পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা রাতের হাওয়া হু হু ক'রে বয়ে চলেছিল।

—তারপর? মায়ের খবর কি বল ত? আজকাল কেমন?

শীতলা একটু হাসল। বলল—আগুন নিবে এসেছে, আর দু'এক বছর! দেহটাও প্রায় আলগা হয়ে এল! কিন্তু একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি!

আলোকনাথ ঘাড় ফেরাল।

শীতলা বলল—সুলতাকে দেখে তাঁর মন আবার বিষিয়ে উঠেছে! সুন্দরী মেয়ের রূপ ওঁর চোখে আর সয় না! পড়তি বয়সে অনেক জঞ্জালই মনে ঢোকে। আচ্ছা, একে কি হিসে বলব আলোক?

—নিশ্চয়ই! এ একেবারে দিবালোকের মতই স্পষ্ট!

অস্তগত ক্ষীণচন্দ্রের সামান্য একটুখানি আভাসে আকাশের অগণন নক্ষত্রবিন্দুগুলি জল্ জল্ ক'রে জ্বলছিল। একটিবার সেই দিকে তাকিয়ে শীতলা বলল—এ আমি বুঝি না আলোক! ভালবেসে যাকে কোলে তুলে নিলাম, দুদিনে যাকে আশ্রয় দিলাম, অন্নবস্ত্র দিয়ে যাকে রক্ষা করলাম, তার ওপর আমার এতখানি বিদ্বেষ মনে এল কি ক'রে? কোন্‌টা সত্যি বল ত? একই মানুষের ওপর এমন অপূর্ব মমতা আর এমন জঘন্য বিদ্বেষ—একই মানুষের মনে জায়গা পেল কি ক'রে?

শীতলার উষ্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে দেবদত্তের হাতটা বাঁধা ছিল। দেবদত্ত বলল—দুটোই সত্যি, মানুষের মন যে!

—তবে কি তুমি বলতে চাও, মায়ের সাধনা মিথ্যে, ধর্ম মিথ্যে, সন্ন্যাস মিথ্যে—মা আমাদের অসচ্চরিত্র ?

—তা বলি না। মানুষের পক্ষে সবই সত্যি। হিসেব ক'রে ত মানুষকে বোঝা যায় না।

কথা বলতে বলতে তারা অনেক দূর এসে পড়েছিল। খানা-খোপরা উঁচু নীচু পার হয়ে দুজনে যেভাবে চলেছিল, তাদের যে আবার ফিরতে হবে তা মনে হয় না।

—আচ্ছা সুলতাকে ত তুমি দেখলে আলোক।

—তা দেখলাম বইকি।

—কি মনে হল ?

—তা কি ক'রে জানব ? মনে আবার কি হবে ? তোমার যত বেয়াড়া প্রশ্ন।

শীতলা সুন্দর একটুখানি হাসল—না, এমনি। অনেক মেয়েই ত তুমি দেখেছ, তাই ওর কথা জিজ্ঞেস কচ্ছিলাম। মেয়েটা মোটেই অসাধারণ নয়, বরং এতই সাধারণ যে সামান্য একটু গোলমাল হলেই চাপা পড়ে যায়।

আলোকনাথ হেসে বলল—শিল্পীর ছবির মত আর কি। অনেক বাজে ছবির মধ্যে মিশিয়ে থাকে, একান্ত ক'রে দেখলে তবে রসগ্রহণ করা যায়।—কিন্তু আর কত ঘুরবে ?

শীতলা বলল—তা হোক, চল। যতদূর পারব চলব তোমার সঙ্গে। অন্ধকারে বেশ লাগছে তোমার সঙ্গে চলতে। চলতে চলতে নিজেদের পায়ের শব্দ শুনছি, শিশির মেশানো হাওয়া গায়ে লাগছে—আহা, তুমি যদি স্ত্রীলোক হতে! সুলতার পাশে বসে থাকলে এজন্যে আমার গা রোমাঞ্চ হয়ে উঠে। মাকে আমি এতকাল ছাড়তে পারিনি কেন জান ? চেয়ে দেখো ত—আমাকে কি সত্যিই সন্ন্যাসিনী বলে মনে হয় ?

দেবদত্ত বহুদিনই তার কথা শুনে অবাক হয়েছে, আজও সে চুপ ক'রে রইল।—নারীসুলভ আত্মদানের কোমল দুর্বলতা

শীতলার মধ্যে ছিল না, তার ভিতর ছিল পুরুষোচিত দুর্বার ভালবাসার বেগ।

—ওটা কি দেখা যাচ্ছে বল ত? সেই ভাঙা মন্দিরটা নাকি?

—হ্যাঁ!

দুজনে সেইদিকে এগিয়ে চলল।

অতি সন্তর্পণে পথ বাঁচিয়ে দুজনে এসে মন্দিরের চত্বরটার ওপর চেপে বসল—শীতলা বলল—গ্রামের আলো চিক্‌চিক্ করছে, মানুষের সাড়াশব্দ কিন্তু কোথাও নেই!

ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে সে পুনরায় বলল—কথা বলছ না যে আলোক?

দেবদত্ত বলল—তুমি স্ত্রীলোক হয়েও নিজেকে স্ত্রীলোক বলে স্বীকার করবে না,—কি কথা বলব? স্ত্রী-পুরুষ যে-কেউ তোমার কাছে এলেই ওই জন্মে বিপদে পড়ে।

শীতলা খিল খিল ক'রে হাসল; কোনো উত্তর দিল না। হাসি থামলে বলল—আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালবাসতে পারতে?

—তার মানে?

বড় বড় চোখ তুলে শীতলা একটিবার মাত্র তাকাল। তারপর বলল—পায়ে এই মাটির দাগ, এই কাদার ছিটে, কপালে ঘামের ফোঁটা তুমি যত্ন ক'রে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে?

দেবদত্ত বলল—আমাকে পর্যন্ত অপমান করছ? আমার কোঁচার খুঁটই আছে, আঁচল কোথা পাব?

শীতলা হা হা ক'রে হেসে উঠে দেবদত্তর পিঠ চাপড়ে দিল।

নিঃশব্দ রাত্রি চরিদিকে থম্‌থম্ করছে। গ্রামের শেষে দীপ-শিখাটি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। আকাশের তিন-তারাটি ঘুরে দক্ষিণ দিকে হেলে পড়েছে! চণ্ডীর পাহাড়ের ওধার থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে আসছিল। বন্য কোনো জন্তুর চীৎকার কিংবা প্রকাণ্ড কোনো পাখীর কণ্ঠস্বর কিনা কে জানে! শীতলা বলল—সত্যি, আমার নিজের মনের অদ্ভুত ইচ্ছাটিকেও একটু প্রকাশ করতে

দাও। ধর, দুপুরবেলায় রোদে দুজনে বেরিয়ে পড়েছি···হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যেন চললাম! ধর, ক্ষেতের আল বেয়েই যাচ্ছি, আচ্ছা মনে কর ভুট্টার ক্ষেত। কিংবা না হয়ত গভীর জঙ্গল, তারই কিনারা দিয়ে রাজপুত্তুর যেত ঘোড়ায় চড়ে···আমরা দুজনে সেখান দিয়ে চলেছি, তোমার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখের তারায় ঘুমের মায়া জড়িয়েছে···আচ্ছা আলোক, তুমি যদি তখন বল, ওই শুকনো কাশের জঙ্গলের মাঝখানে···কেউ দেখবে না··· দুজনে শুয়ে শুয়ে পথশ্রম লাঘব করতে চাই···তুমি স্ত্রীলোক হয়ে যদি বল, আমার কোলে মাথা দিয়ে বিশ্রাম চাও, যদি তোমার চোখে জল আসে, যদি জানি সারাজীবন তোমার একটি পুরুষের ভালবাসার অভাবে মিথ্যা হয়ে গেছে···একলা সেই মাঠে, কাশের সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে নারীর যা কিছু সব যদি তুমি চোখের জলে বিলিয়ে দাও—

—উঠলাম! অকারণে তুমি যে এমন চোখের জল ফেলবে তা আমার জানা ছিল না শীতলা! আমি মেয়ে হলাম না কেন, আর তুমি কেন পুরুষ হলে না, এ নালিশের কোনো মানে আছে? এসো উঠে এসো—ছিঃ।

হাত ধরে দেবদত্ত তাকে তুলে আবার পথে নামিয়ে আনল। তারপর বলল—আশ্রমের মেয়েদের কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবার দরকার ছিল, কিন্তু আজ থাক! এত রাতে দুজনে ফেরা···যদি কেউ দেখতে পায়···মেয়েরা কি মনে করবে বল ত? তোমার সঙ্গে পথে বেরোনোর বিপদ আছে দেখছি, কখন মেয়েমানুষ বলে হঠাৎ জড়িয়ে ধরবে তার ঠিক নেই!—এসো একটু পা চালিয়ে।

হাসির সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে শীতলা তার গলা জড়িয়ে ধরে চলতে লাগল।

॥ ১২ ॥

শীতলার চরিত্র ছোট নয়—বিধাতা তাঁকে পৃথিবীর পটে বড় ক'রে এঁকেছিলেন ? সে এসে সুমুখে দাঁড়ালে আর সবাই আড়ালে পড়ে যায়।

—মাটিতে নুয়ে পড়েছিস তাই, মাথা উঁচু ক'রে না দাঁড়ালে তুই ত চলতে পারবিনে !

কাঁধের পাশে মুখ লুকিয়ে সুলতা বলল—তুমি আমার সবই শুনেছ দিদি, তোমার কাছে কিছুই লুকোইনি।

শীতলা বলল—পাপ যার মধ্যে নেই, দরকার হ'লে সে দুর্নীতি সবাই মাথা পেতে নেবে ! তোর জীবনে কাঁটাও যত, ফুলও তত। বিধাতা তোকে অপমান করতে গিয়ে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন ! তোর মতন দুশ্চরিত্র হওয়া মানুষের গৌরব। নারীত্বের সঙ্গে সতীত্বের যে কত বড় তফাত তা তোকে না দেখলে বুঝতামই না ! কিন্তু ভাই, তোকে এমনভাবে দিন কাটাতে দেখলে আমি ত থাকতে পারব না ! এবার যে তোকে কাজের ভার নিতে হবে।

—কি করতে হবে তুমি বলে দাও দিদি।

শীতলা একটুখানি হাসল। বলল—ও ত পরের মুখ চাওয়া ? কিন্তু এর থেকে তোকে আমি মুক্তি দেব। মানুষ যখন কাজ খুঁজে পায় না, তখনই সে সকলের চেয়ে অসহায় ! নিজেকে তুই ভাই এবার আবিষ্কার ক'রে নে !

শীতলা বলল—না ভাই না, চোখ মেলে আজ আর বাইরের মানুষের দিকে তাকালে চলবে না, নিজের ভেতরে এবার চোখ খুলে দিতে হবে। তোর মাটির নীচে অনেক গুপ্তধন লুকিয়ে আছে তাদের খুঁড়ে বার ক'রে নে !

সন্ন্যাসিনী মা এসে ভেতরে ঢুকলেন। চেহারার মধ্যে তাঁর যেন

কোথায় একটি পীড়াদায়ক পরিবর্তন এসেছিল। কথাবার্তা আজকাল তিনি খুবই অল্প বলেন।

বললেন—হিসেবে পাঁচখানা ক'রে মেয়েদের কাপড় বরাদ্দ ছিল, ছ'খানার হিসেব কে করলে শীতলা?

শীতলা বলল—ওটা হিসেবের ব্যাপার, হিসেব ত আপনি কোনোদিন দেখেন না মা?

মা গম্ভীর হয়ে বললেন—আশ্রমের হিতাহিতটা মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত না? মেয়েদের দিয়ে কাজ হবে অল্প অথচ ব্যয় হবে বেশী—এ ত দেউলে হবার নিয়ম।

শীতলা হেসে বলল—আমার ওপর আপনার মেজাজটাও সুবিধের নয় দেখছি। কিন্তু মা, ব্যয় অল্প ক'রে এবং কাজ বেশী আদায় ক'রে যেটা হয় সেটা পাকা ব্যবসা-বুদ্ধি! তাই নিয়েই দেশ-বিদেশে যত অশান্তি!

মা বললেন—শীতলা, সাধারণ বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে আমি কম নই! কিন্তু এটা বোঝো ত বুদ্ধিমান মেয়ে, ভিক্ষে ক'রে মানুষের সেবার সৌখীন মহত্ত্ব দেখাতে গেলেও একটি শৃঙ্খলা থাকা দরকার; হিসেবটা থাকলেই সব জিনিসের ছন্দ থাকে, নইলে সবই ছন্নছাড়া!

শেষ কথাগুলির মধ্যে মায়ের মুখ থেকে যে উত্তাপটুকু বেরিয়ে এল, শীতলা তাতে আবার একটু হাসল। হেসে বলল—কিন্তু মা, হিসেব কষতে কষতে দরকারের ল্যাজা-মুড়ো যদি বাদ যেতে থাকে তা হলে মেয়েরা যে বড় কষ্ট পাবে! না খেয়ে চলে কিন্তু মেয়েদের আবরু না রাখলে যে চলে না মা?

কথাগুলি শুনে মা একটু থমকে দাঁড়ালেন, তারপর চলে যাবার আগে বেশ একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে গেলেন—তোমাকে নইলে আমার চলবে না তাই জেনেই তুমি যখন তখন আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসো শীতলা! তবুও বলে যাই, যে-মেয়ে কোনো কাজই করে না, এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি যার নেই, তাকে ভাত-কাপড় দিয়ে বসিয়ে বসিয়ে পোষবার শক্তি আশ্রমের ফুরিয়ে গেছে!

এই বেলতলার ছাদটাও ঘিরে দিও। ছোট ছেলেপুলে ওখান থেকে পড়ে যেতে পারে। রাজমিস্ত্রী আর ছুতোর ডাকিয়ে—কই, সবুজ রঙের আলোর ডুম্ গোটাকয়েক আনবে বলেছিলে যে? সাদা আলো সব সময় তোমার চোখে যে সয় না!

আপনার কথার আনন্দেই সর্বাঙ্গ যেন তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এই সরল, বিশেষত্বহীন, নির্বোধ মেয়েটির মৃদু প্রগল্ভতা, ভীরু সঙ্কুচিত একটি পাখীর এই আকস্মিক কলকাকলী সত্যেনকে মুহূর্তেই একেবারে মুগ্ধ করল। একটু হেসে বলল—বাজে কথা তোমার মুখে এমন চমৎকার শোনায়, ভালবাসার ভাষা তোমার মুখে যদি শুনতে পেতাম সুলতা!

তারপর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সত্যেন তাকে কাছে টেনে নিল।

আহারে বসে সত্যেন একেবারে অবাক হয়ে যায়।

—এ কি, এ যে রাজভোগ, এত কি হবে?

সুলতা একপাশে বসে থাকে। বলে—এমন আর কি?

—পাগল কোথাকার, আমি কি রাক্ষস?

দু'জনেই হাসে।

—পরিমাণে যে কোনোটা বেশী তা বলছিনে, কিন্তু এত রকমের খাবার যোগাড় করতে মানুষকে অনেক বেগ পেতে হয়। একেবারে নিখুঁত, কোন্‌টা আগে খাই বল ত?

লজ্জায় সুলতা মাথা হেঁট ক'রে থাকে। হেসে, আনন্দে সোরগোল ক'রে সত্যেন খেতে সুরু ক'রে দেয়। প্রত্যেকটি আহার্যবস্তু আস্বাদন করবার জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে যে একটি মধুর অনুরোধ আসা উচিত, সত্যেন সেকথা একদম ভুলেই যায়; অনুরোধের ভাষা, নিকটতম আত্মীয়তার ভাষা সুলতার মুখেও আসে না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এমনিই যে একজনের আনন্দোচ্ছ্বাস আর অপর জনের নিঃশব্দতা—কেউ দাঁড়িয়ে দেখলে হঠাৎ কোনো রূঢ় মন্তব্য সুলতার প্রতি আসতে পারে।

আহার কোনো রকমে শেষ ক'রে উঠে সত্যেন বলে,—জান না

বুঝি, মেয়েরা কেমন ক'রে মাথার দিব্যি দিয়ে স্বামীদের খাওয়ায়?
ব'লে একটুখানি করুণ হাসি হেসে সে কলঘরের দিকে চ'লে যায়।

কাছারি থেকে ফিরে সত্যেন একটু ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢোকে

—পথ ছেড়ে একটু কোথাও সরে গিয়ে বসো দেখি সুলতা। পায়ে পায়ে ঘুরলে হয়ত তোমার লেগে যেতে পারে, যে গোঁয়ারের মত আমি হাত-পা ছুঁড়ছি।

ভীরু শশকের মত সুলতা একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এতবড় অপরাধ সে যেন আর কোনো দিন করেনি।

সত্যেন আর কিছু বলে না, শান্তভাবে নিজের হাতেই জামার বোতাম খোলে, মাথার টুপিটা হুকে টাঙিয়ে দেয়, পায়ের মোজা খুলে রাখে—তারপর একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে দেখে—সরবৎ, জলখাবার, পান, সিগারেট সবগুলি পাশাপাশি সাজানো।

হাসি আর সে চাপতে পারে না। বলে—দরকারী জিনিস ত সবই পেয়ে গেছি, তবে আর তোমাকে দরকার কি!

তাই ত, এই সামান্য কথাটা এতক্ষণ তার মনে হয়নি! সে ত ভয়ানক বোকা!

—থাক্ থাক্, আমি যেতে বলিনি—তুমি যদি যাও, আহারের রুচিটাও চলে যাবে তোমার সঙ্গে। সুলতা, আজকাল কি তুমি অনুরাগ ছেড়ে রাগের মহলা দিচ্ছ?

একটুখানি থতিয়ে সুলতা একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—রাতের জন্য আবার রান্নাবান্না—

সে ত রাতের কথা! পশ্চিম দিকটা এখনও রাঙা হয়ে রয়েছে, সন্ধ্যাতারা এখনও মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে—রাতের এখনও অনেক বাকি সুলতা!

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সত্যেন বলল—সামান্য মানুষ, সামান্য একটু আরামের জন্যে কাতর হয়ে পড়ি। যে ক'টা দিন বাঁচি, হেসে-খেলে হৈ-চৈ ক'রে চলে যাবার ইচ্ছে।

শীতলার মুখখানা অপমান-বোধে রাঙা হয়ে উঠল। একবার সে কাঠের মত সুলতার মূর্তির প্রতি তাকাল, পরে গলা বাড়িয়ে মায়ের পথের দিকে তাকিয়ে বলল,—আপনিও তাহলে কোশাকুশি গীতাপাঠ ছেড়ে এসে তাঁতের মাকু চালাচালি করুন।

মা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—কি বলছ?

শীতলা বলল—বলছি যে, আমি আর আপনি কর্তৃত্বের ভার নিয়ে থাকব, আর সবাই আমাদের পায়ের তলায় পড়ে খেটে মরবে তা ত হতে পারে না! আজ থেকে সবাই সমান হোক।

মা মুখ রাঙা ক'রে চলে গেলেন।

দুইটি ডানা দিয়ে শীতলা বাইরের ঝড়-ঝাপটা থেকে সুলতাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করল।

অনেক সময় এমন দেখা গেছে, সুলতা অলক্ষ্যে শীতলার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে-মুখে কোথায় যেন একটি নিশ্চিন্ত নির্বিকার ও প্রশান্ত জীবনের ছাপ রয়েছে। গায়ের রংটা তার রোদে পোড়া, মেটে, বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখলে চক্‌চকে তামার একটি আদল আসে। আশ্রমের অনেক মেয়ে এদের দুজনের সম্বন্ধে কানাকানি ক'রে বলে—গঙ্গা-যমুনা এক জায়গায় এসে মিশেছে।

শীতলা যেন আঙুরের মত সকল সময়েই টসটস করে। হাসতে হাসতে বলে—প্রথমে মনে হয়নি, না রে? আমাকে এমন পাথরের মতন কঠিন ক'রে কখনো ভেবেছিলি?

ঘাড় নেড়ে সুলতা জানায়, না।

শীতলা বলল—কিন্তু আমার চেয়েও নিষ্ঠুর আর একজন আছে, সুলু! বুক ভেঙেছে তার বহুবার, কিন্তু এতটুকু টসকায়নি। অপমান তার গলায় সত্যিই বরমালা পরিয়েছে, আঘাত হয়েছে তার অঙ্গের অলঙ্কার, অন্যায় অত্যাচারকে সে করেছে বিভূতি,—সুলতা, আমরা যদি নদী হই সে তবে সাগর।

সুলতা নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। চোখের কোণে তন্দ্রাজড়িত একটি ঈষৎ জলরেখা নিয়ে শীতলা জানালার বাইরে

কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি মেলে উদাসীন কণ্ঠে বলল—প্রথম জীবনে দুঃখকে সে হাসিমুখে বরণ করতে পারেনি, ব্যথার দায়ে বহুবার সে আত্মহত্যা করেছে, অকারণ অপবাদ আর লাঞ্ছনাকে সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেনি,বুক-ভরা বেদনা নিয়ে অনেকবার সে ঘরছাড়া হয়ে চলে গেছে।

—তিনি কে দিদি ?

শীতলা ঘাড় ফিরিয়ে একটুখানি হাসল। বলল—হ্যাঁ, তাকে আঙুল বাড়িয়ে চিনিয়েই দিতে হয় বটে! দুঃখকে সে যে অঞ্জলি ভরে পান করেছে, বেদনায় যে তার দুকূল ছাপাছাপি, তাকে দেখে একথা কিছুতেই বোঝবার যো নেই! সুলতা, বিজ্ঞাপন দিয়ে সে নিজেকে জাহির করে না, 'ব্যথার' পরিচয়পত্র কপালে এঁটে সে জীবন-স্মৃতির ফিরি ক'রে বেড়ায় না! আর তার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ? —একটু হেসে আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে আবার বলল—বোঝাতে তোকে পারব না সুলতা, যেখানেই তাকে প্রশংসা করতে যাব সেখানেই সে ছোট হয়ে যাবে!

—কোথায় থাকেন তিনি দিদি ?

শীতলা আবার হাসল—আজ অবধি বুঝতে পারিনি! রহস্যময় সে মোটেই নয়! মানুষের অতি কাছেই তার বাস। তবু ভাই কেবলই যেন মনে হয় তার ধরা ছোঁয়া পাইনে! ধরে বেঁধে তাকে দেখতে গেলেই সে আলগা হয়ে যায়। সত্যি সত্যি, কোথায় গেলে যে তাকে পাব আজ অবধি তার হদিস পেলাম না!

বাইরে ছোট ছোট মেয়েরা তখন ভিড় ক'রে পড়তে এসেছে! তাদের কলরব শুনে উঠে যাবার আগে শীতলা বলল—তার কথা গানের মত, গাইতে গাইতে আমার নিজেরই নেশা ধরে যায়!

যে মানুষটির সম্বন্ধে এত কথা হল—সে যেন একটি রসমূর্তি নিয়ে সুলতার চোখের সুমুখে এসে দাঁড়াল! কিন্তু হায় রে, সে মেয়ে কি পুরুষ এই আসল কথাটাই যে জানা হল না! পুরুষ ব'লে সুলতা তাকে একবার কল্পনা করল! যে-রূপটি শীতলা তার কাছে প্রকাশ করল উপেনের সঙ্গে তার অনেকখানি যেন মেলে!

হ্যাঁ, উপেনের কথা সে ভুলতে পারবে না বটে। উপেন একদিন তার সমস্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল। শীতলাদির দেখা পাবার ঠিক আগেই আর কি।

আর সে যদি নারী হয়।

কিন্তু শীতলাকে পার হয়ে আর কোনো আদর্শ নারীই তার দৃষ্টিতে এল না। মা? ন্-নাঃ।

দুপুরবেলা সুলতা শীতলার দপ্তরে বসে কাজ করছে,—অঙ্ক কষলে নাকি মাথা পরিষ্কার হয়, শীতলাদি বলে।

দেবদত্ত এসে ঘরে ঢুকল। জড়সড় হয়ে সুলতা উঠে চৌকিতে গিয়ে বসল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে খাতা দেখে সে দু'য়ে আর দু'য়ে চার মেলাতে লাগল।

জিনিসপত্রে ভাঁড়ারে বসদে ঠাসা আড়ৎ ঘরটি ছাড়া আর কোথাও জায়গা ছিল না। মেঝের ওপর মাদুর বিছানো রয়েছে। দেবদত্ত তার ওপর বসে পড়ে টাকা-কড়ি কাগজপত্র বার ক'রে রাখতে লাগল। ছ'টাকা দশ আনা থেকে পাঁচ টাকা তেরো আনা বাদ দিতে সুলতা তখন আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

দেবদত্ত নিজের মনেই বলল—শরতের মাঝামাঝি, তবু এত গরম। একটু আগে বিষ্টি হয়ে গেল, তবু ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছি এইটুকু মাঠ পার হতে গিয়ে।

বাঁ-হাতের আঙুলের করের উপর সুলতার বুড়ো আঙুলের গোণাগণি চলছিল—ঠিক সেই গোণার ভঙ্গীতেই তার আঙুলগুলি হঠাৎ থেমে গেল। নিশ্বাস ফেলেই তার মনে হল, আহা! ঘাম হবে না অত পরিশ্রম করলে? তা ছাড়া যে রোদ্দুর! হাতপাখা থাকলে সে নিশ্চয়ই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিত।

দেবদত্ত কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ করল না। মুখ তুলে বিরস এবং অতি সাধারণ কণ্ঠে বলল—শীতলা কোথায়?

ঘাড় আর সুলতা সেদিকে ফেরাতে পারল না। সসঙ্কোচভাবে বলল—মেয়েদের পড়াতে গেছেন।

—ও, একটু দরকার ছিল। আচ্ছা না হয় ত অন্য সময়ে—না না, উঠতে হবে না, এমন কিছু বিশেষ,—হিসেব মেলানোর চেয়ে পড়ানোটা বেশী দরকারী।

তা ত বটেই। সুলতার এই সামান্য কথাটায় খেয়াল হল না? গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে করতে এক সময় ঘাড় তুলে দেবদত্ত বলল—তিন-তিরিক্ষে নয় আর চারে তেরো, আর পাঁচে? আঠারো—কেমন? আচ্ছা, আঠারো আর তেরোয়? আঠারো আর তেরোয়, কত?—সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে গোণবার চেষ্টা করল।

মনে মনে হিসেব ক'রে সুলতা হঠাৎ বলল—একতিরিশ।

—বেশ? একতিরিশের এক—ব'লে দেবদত্ত পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর লিখল—হাতে থাকে তিন।

সুলতা আবার ভাবতে বসল, দশ আনা থেকে তেরো আনা কেমন ক'রে বাদ দেওয়া চলে!

দেবদত্ত নিজের মনেই বলল—তিন চারে বারো, তিন পাঁচ পনেরো, তিন সাতে একুশ, তিন-এগারো—তিন-এগারো কত হল?

সুলতা বলল—তেইশ!

সোৎসাহ আনন্দে দেবদত্ত বলল—আমার মাথা!

কানের ডগা পর্যন্ত সুলতার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

হাসতে হাসতে দেবদত্ত বলল—আপ—তুমি ভারি বেহিসেবী।

তা বটে! তেইশের জায়গায় তেত্রিশ বললেই ত সব গোল মিটে যেত? কিন্তু দশ আনা থেকে তেরো আনা বাদ দেওয়া বড় কঠিন।

—নাম কি?—দেবদত্ত জিজ্ঞাসা করল।

—সুলতা!

—সু, ল আবার তা? সু-এর মুড়ো চিবিয়ে লতা কেমন মানায়?

উত্তর দেবার আগে মা এসে ঢুকলেন। রাঙা গেরুয়ায় মা যেন জ্বলছেন। তপঃক্লিষ্টা নারীটির মুখে যে ভাবটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে

সেটি ঠিক আশ্রমের উপযোগী নয়। ছুটি নরনারীকে একা এখানে থাকতে দেখে তাঁর একেবারেই ভাল লাগল না। তাছাড়া কয়েক দিন থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে দু'তিনটি মানুষের কেমন যেন একটি চক্রান্ত চলছে। কণ্ঠের কটুত্ব যথাসম্ভব গোপন ক'রে তিনি বললেন—সেই ক্ষীণ মিহি কণ্ঠই তাঁর শোনা গেল—দেবদত্ত, তুমি বোধ হয় শীতলার মতামতকে শিরোধার্য করনি?

—সে কি! কি বলছেন? শীতলার মুখ থেকে আমি ত সব শুনেছি মা?

—তা আগেই আমার মনে হয়েছে। আমাকে যখন সবাই জানে তখন আমার মতামতটা জেনে নিতেই বা দোষ কি! তোমার ওপর আমি একটি ভার দিতে চাই দেবদত্ত? অক্ষম মেয়েগুলোর ভার তুমি নেবে?

—এ ত বুঝতে পারবার মতন কথা নয় মা?—দেবদত্ত একটু হাসল।

অলক্ষ্যে একবার গম্ভীর দৃষ্টিতে মা সুলতার দিকে তাকালেন। স্নেহের চেয়ে একটি সুদূর ঔদাসীন্য সে-দৃষ্টিতে মাখানো। সে-দৃষ্টি নিষ্ঠুরের মতন সবাইকে শরবিদ্ধ করে। সুলতা ভয়-ব্যাকুল হয়ে মাথা হেঁট করল।

মা বললেন—বুঝতে পারা অতি সহজ দেবদত্ত, আশ্রম যে-মেয়ের ভার নেবে, আশ্রমের ভারও যে তাকে কিছু নিতে হবে।

দেবদত্ত খানিকক্ষণ মাথা নীচু ক'রে রইল। মা পুনরায় বললেন —শীতলা আমাকে ভুল বুঝেছে,—সে অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হোক কিন্তু অন্ধ না হয়! মনকে কঠিন ক'রে না বাঁধলে কোনো বড় কাজে শৃঙ্খলা রাখা যায় না—এ আমি বিশ্বাস করি দেবদত্ত! আশ্রমের যারা বোঝা হয়ে থাকবে তারা পথ দেখুক, এই আমি শীতলাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম! তুমি এ-ভার নিতে পারবে?

মা যে সুলতাকে দৃষ্টি বহির্ভূত করতে চান, একথা দেবদত্ত বুঝল। সুলতার রূপ তিনি সহ্য করতে পারেন না, সুলতার অবস্থান তাঁকে

পীড়া দেয়, সুলতার অস্তিত্ব তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছে। সুলতা তাঁর চক্ষুশূল!

দেবদত্ত বলল—দিনকতক সময় দিন আমাকে।

মা রাজী হ'লেন—তারপর এদিকে ফিরে স্পষ্ট উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—এখানে তোমার কি কাজ হচ্ছিল সুলতা?

সুলতা কেঁপে উঠল। মা বললেন—অন্যের কাজ পণ্ড করায় বাহাদুরী নেই। যে বস্তুটার সুবিধে তুমি নাও সেটার থেকে এখানকার মেয়ে-পুরুষ অনেক দূরে থাকে। লজ্জার সীমা এড়িয়ে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে অপমানের কথা। শীতলার ধাতু সব মেয়ের নেই। কাজকর্মের সময় একটু আড়ালে সরে যেতে হয়। বুঝলে?

সুলতা আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে চলে গেল।

বাইরের মাঠে তখন উষ্ণ জলো হাওয়া হু হু ক'রে বয়ে চলেছে। আকাশ একেবারে গাঢ় নীল, সূর্যের আলোয় ধবধবে সাদা লঘু মেঘের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝরা শিউলি ফুলের শুকনো মিষ্ট গন্ধ এত রোদেও ভুর ভুর করছিল।

জীবনে আজ প্রথম সুলতা অপমান বোধ করল। অপরাধ সে কিছুই করেনি, অপমান তাই তার বুকে বড় বাজল। দেবীর আসনে মাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রতিমার মত সে পূজা করেছিল, আজ সেই প্রতিমা খড়্গের আঘাতে তার কণ্ঠনালী ছেদন করলেন!

কিছুদূর গিয়ে মাঠের মাঝখানে সে এক জায়গায় চুপ ক'রে বসল। ঘাসের ডগায় ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল ধরেছে। টুকরো বাতাসের ছোঁয়ায় সেগুলির মাথা দুলছে। চারিদিকের পাহাড় আর অবারিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার বাল্যজীবনের কথা মনে পড়ল। সে-জীবন তার আনন্দময় ছিল, আর-একবার কি সে-জীবন ফিরে পাওয়া যায় না! মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল, পূর্ব-জীবনের সেই সুন্দর দিনগুলির মালা গেঁথে আর-একবার কি সে গলায় পরতে পারে না? আজ সুলতা আর চোখের জল ফেলল না—আপনাকে বুঝতে পেরে চোখের জল তার শুকিয়ে গেল। এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা যার

নেই, সংসারে যার কোনো দাবিই নেই—ভেসে ত তাকে চলতেই হবে! কিন্তু বাঁচবার অধিকার তারও ত কিছু আছে! সম্বল জীবনে হয়ত তার কিছুই নেই কিন্তু পৃথিবীর এই আলো-হাওয়া, এই মাঠ, ওপরে ওই আকাশ, তার নীচে অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী ধরণী—এর থেকে মানুষ তাকে উচ্ছেদ করতে চায় কোন্ অপরাধে? কোন্ অপরাধে তার এ অপমান!

সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিল! হৃদয়ের বন্ধ দ্বারগুলি তার যেন আর খুলতেই চায় না, কপাটে কপাটে যেন মরচে পড়ে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে মাঠেই সে খানিকক্ষণ পায়চারী ক'রে বেড়াল। বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকে সে একবার স্পষ্ট ক'রে দৃষ্টি মেলে তাকাল! সবুজ মাঠের কোণে ঘন জঙ্গল ক্রমে উঁচু হয়ে একেবারে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। আকাশকে আকাশ ছাড়া আজ তার আর কিছুই মনে হল না। নীচে নদী বয়ে চলেছে—আজ বহুদিন পরে বিদেশী একখানা জেলেডিঙিকে ভাসতে দেখা যাচ্ছে! একটু আগে এক পসারিনী ওপারের বালুচড়া থেকে এক মোট বালি তুলে নিয়ে চলে গেছে। যা সহজ, যা স্পষ্ট, যা সত্য—আজ সুলতার চোখে কেমন ক'রে না-জানি একান্তভাবেই ধরা দিল। যেন একটি আত্ম-বিশ্লেষণের শক্তি আয়ত্ত করেছে।

খাতা-পত্র হাতে নিয়ে দেবদত্ত চলেছিল মাঠ পার হয়ে। সুলতা তাকে দেখে একটু চকিত হয়ে থেমে গেল। যেতে যেতে দূর থেকে হাত বাড়িয়ে দেবদত্ত তাকে একবার ডাকল।

সুলতা কাছে এসে নতমস্তকে দাঁড়াতেই দেবদত্ত বলল—তুমি কি মায়ের ওপর কোনো অন্যায় করেছিলে?

মাথা উঁচু ক'রে সুলতা বলল—না।

—কিন্তু উনি যদি তোমার ওপর শত্রুতা করেন, তাহলে কোথায় যাবে তুমি?

—সে কি উনি পারবেন করতে?

—সব জিনিসের জন্যই তৈরী হয়ে থাকা ভাল। শীতাংশুর মুখে

তোমার সবই শুনেছি।—বলতে বলতেই দেবদত্ত হাসতে লাগল—এ রাজত্বটা আমাদের নয়—মায়ের! মেয়েদের মধ্যে তোমার যে বদনাম রটে গেছে, সে-দোষ মেয়েদের নয়, সাম্রাজ্য চালাতে গেলে একটা রাজনীতি দরকার—এখানে সে রাজনীতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ দিয়ে তৈরী! তাছাড়া ব্যবসা-বুদ্ধি এখানে এতই প্রবল যে, স্বেচ্ছাতন্ত্র না চালিয়ে উপায় নেই! তোমাকে কাজ করতে বলা হচ্ছে, কিন্তু কাজ না দিয়ে উল্টে তোমার কপালে দাগ দিয়ে কিসে তাড়ানো যায়, সে ব্যবস্থাও চলেছে!—

দেবদত্তর মুখ লাল হয়ে উঠল।

সুলতা বলল—আপনি এখানে থাকেন কেমন ক'রে?

দেবদত্ত বলল—থাকিনে মোটেই, অনেক দিন থেকে শীতলার সঙ্গে আমার আলাপ, তাকে আমি ভালবাসি, মাঝে মাঝে তাই দেখা-শুনা করতে আসি। কিন্তু অমনি আসিনে, সন্ন্যাসিনীর কাজও কিছু ক'রে দিই। কাজ কিছুই না ক'রে শুধু যদি শীতলার বন্ধু হতাম তা হলে এতদিন দুশ্চরিত্র বলে আমার কলঙ্ক রটত। আর সে কলঙ্ক আমার পক্ষে হ'ত ভারি স্বাভাবিক! এসো, আমরা এখানে একটু বেড়াই, শীতলা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে!

চলতে চলতে সুলতা বলল—আপনি থাকেন কত দূরে?

দেবদত্ত শিশুর স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল—বহুদূর রহস্যপুরে নয়, খুবই কাছাকাছি। হাত বাড়ালেই আমাকে পাওয়া যায়।

উভয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলতে লাগল। দেবদত্ত মুখ ফিরিয়ে এক সময় বলল—যতদূর শুনলাম, তোমার মুখের ওপর সকল দরজা বন্ধ হয়ে গেছে! কিন্তু তা হোক, স্থান ক'রে না নিলে স্থান কেউ দেবে না, এই হচ্ছে নিয়ম। মায়ের গোপন প্রবৃত্তি তোমাকে এখান থেকে একদিন কিন্তু সরিয়ে দেবেই।

সুলতা বলল—শীতলা'দি'কে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না!

—অপমান করলেও না?

সুলতা বড় বড় দৃষ্টি মেলে বলল—অপমান আমার সওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে দেবদত্তবাবু।

একটুখানি হেসে দেবদত্ত আবার বলল—অর্থাৎ এই তোমার শেষ আশ্রয়! কিন্তু না, এ তোমার ছদ্মমুখী! অপমান সয়ে টিকে থাকা চলে, বাঁচা চলে না! সকলের অপমান সইবার যে-শক্তি তা সবার নেই! বরং আঘাত সইতে পার, অপমান নয়!

সুলতার চোখে কে যেন জ্যোতির্লেখায় এই কথাগুলি লিখে দিয়ে গেল। এ বাণীর প্রয়োজন তার জীবনে ছিল,—আশীর্বাদের এ আভাস সে মাথা পেতে নিল। কণ্ঠে তার কান্না এল না, কিন্তু বুকে এল আবেগ। নিজের কাছে নিজেকে পরিচিত ক'রে দেবার এই যে ইঙ্গিত—দেবদত্তর কাছে আপনাকে সে ধন্য মনে করল।

সে বলল—শীতলাদি সেদিন কি আপনারই কথা বলেছিলেন?

দেবদত্ত বলল—হতে পারে কিন্তু এও বলে রাখি, আমার সমস্ত জীবনের ইতিহাস হয়ত লাঞ্ছনা, বেদনা ও দুঃখের কাহিনীতে ভরা, কিন্তু তা বলে তার জন্যে আমার কোনো গৌরব নেই। আমার তপস্যা এগিয়ে যাবার। বিপথে নয়, পথ থেকে পথে। সে পথ অন্ধকার, তাই যাব আলো জেলে জেলে।

কম্পিত কণ্ঠে সুলতা বলল—সে পথ কি আপনার চেনা?

—না, চেনাও নয় জানাও নয়—চলতে হবে নিজেরই সাধনায়—দেবদত্ত তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলল—অল্প থেকে সে বৃহৎ হয়ে গেছে, সঙ্কীর্ণ থেকে হয়েছে বিস্তৃত! ছোট জোকোসয়ের পাশ থেকে সে সরু পথটি চলে গিয়ে পৃথিবীর সকল পথের সঙ্গে মিশে গেছে। এত আমার স্বপ্ন নয়, কবি-কল্পনাও নয়—জীবন আমাকে এই পথে যাবার কথাই কেবল বলছে!

অত্যুগ্র আবেগের নেশায় সুলতা থর থর ক'রে কাঁপছিল। দেবদত্ত বলল—নিজেই যে পথ হাতড়াই, অন্যকে তার সন্ধান দেবার সাহস আমার নেই। গোড়ায় ছিল নতুন পৃথিবী তৈরী করার বাসনা, গোড়ায় সবারই তাই থাকে—কিন্তু আর না, রূপের প্রতিপত্তি নষ্ট হবার ভয়ে

সন্ন্যাসিনীকেও যখন দেখলাম, গায়ের চামড়ার প্রতি ঈর্ষা পার হতে পারল না, প্রকৃতির কাছে তখন হার মেনে গেলাম। থাকুক নতুন পৃথিবী! যে-পথ জগৎকে ছাড়িয়ে বিশ্বের দিকে মিলিয়ে গেছে, এই জীবনে সেই পথেই পৃথিবীকে পার হয়ে যেতে হবে। আকাশ পথে উড়ে যাওয়াই মর্ত্যবাসীর সাধনা হোক্!

সুলতা বলল—আমার তবে কোথায় জায়গা হবে বলে দিন?

দেবদত্ত সস্নেহ মমতাময় হাসি হাসল,—জ্যোতিষী হলে বলতাম। কিন্তু জায়গা তোমার কোথায় নেই সুলতা! শীতলা তোমার প্রসঙ্গে বলছিল, স্রোতে-ভাসা! তাই হোক, স্রোতে ভেসে ভেসে গিয়ে তুমি সাগরে অদৃশ্য হয়ে যাও, এই কামনাই করি! কামনা করি, এবার তোমার জীবনে অতৃপ্তি আসুক, তৃষ্ণা হোক দীর্ঘতর, আরাম যাক্ দূরে, পায়ের তলার পথ হোক কণ্টকিত—তবেই মিলবে শক্তির সন্ধান, বিধাতার সঙ্গে হবে বন্ধুত্ব!—ওই যে, শীতলা হাসতে হাসতে আসছে আমাদের দিকে!

সুলতা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে দেবদত্তর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল।

॥ ১৩ ॥

শীতলা এল হাসতে হাসতে। এ হাসিটি তারই একার, এর নকল আর কারো মুখে ফোটে না। এই প্রতি-পরিচিত হাসিটির সঙ্গে তার অন্তরের রূপটি সুন্দর হয়ে ভেসে ওঠে। বলল—পায়ের ধুলো মাথায় নেবার পালা ত শেষ হল দেখলাম, আশীর্বাদটা কি হল শুনি?

দেবদত্ত বলল—আশীর্বাদের ভারটা তোমার ওপর।

সুলতার মুখ আজ আর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল না। শক্তির স্ফুরণ যখন হয়, মাথা তখন আপনিই উঁচু হয়ে ওঠে। দেবদত্তর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে যে-কথাটা আজ পর্যন্ত কোনোদিন সে বলতে

পারেনি সেই কথাটি স্পষ্ট ক'রে বলল—নিজেকে নষ্ট করতে বসেছিলাম দিদি, আর নয়। অনেক কাজই বাকী আছে, চুপ ক'রে আর আমার বসে থাকলে চলবে না।

শীতলা তার মুখের দিকে মুখ ফেরাল। ধোঁয়া ছাড়া যেখানে আর বিশেষ কিছুই দেখা যেত না আজ সেখানে হঠাৎ উজ্জ্বল-অগ্নি-শিখার সন্ধান পেয়ে সে কিয়ৎক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর বলল—কাল পর্যন্ত এ ঝাঁজ্ থাকবে?

—ঝাঁজ্ নয় দিদি!—সুলতা দেবদত্তর দিকে একবার তাকিয়ে বলল—সবাই আমাকে ঘা মেরে তৈরী করেছে, অপমানের পরে অপমানে নিজের পথ আমি চিনতে পেরেছি!

শীতলা একটু হেসে বলল—বুঝলাম! আয় তবে আশ্রমে, থাক্ এখানে,—কাজই যদি করবি, আয় তবে আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।

দেবদত্ত বিজ্ঞের ভান ক'রে বলল—মন্দ প্রস্তাব নয়!

সুলতা স্পষ্ট জবাব দিল—না, এখানে আমার জায়গা আর নেই!

শীতলা বলল—আমি যদি ক'রে দিই!

—না দিদি। মাথা হেঁট ক'রে বিনীতকণ্ঠে সুলতা আবার বলল—মায়ের কাছে আমার থাকা আর চলবে না।

দেবদত্ত একটুখানি সরে দাঁড়িয়েছিল। শীতলা তার সঙ্গে চোখ-চোখি ক'রে হাসতে লাগল। তারপর বলল—বেশ এও বুঝলাম, কিন্তু আমার কথা কি ভাবচিস ভাই?

সুলতা বলল—সে ত বলেই রেখেছি! তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব দিদি।

—বাপরে, তাই নাকি? কোথায় যাবি?

—না দিদি, ঠাট্টা নয়! দুজনে আমরা যাব শহরে, অনেক মানুষ যেখানে···অনেক গোলমাল, গাড়ী ঘোড়ার আওয়াজে কান পাতা যায় না···মানুষ যেখানে পরিশ্রম ক'রে খায়, ভিক্ষে করে, আমরা সেখানে যাব দিদি। সকলের মধ্যে মিশে থাকব—সকলের দুঃখ ব্যথা আর আনন্দের ভাগী হয়ে পথের ধারে আমাদের দিন কাটবে।'

—কি কাজ করবি ? মাষ্টারী, না চরকা কাটা ?

—যা পাবো তাই। কোনো বাচ-বিচার থাকবে না দিদি। শহরের মাটি বিক্রী করলেও দিন চলে, তাই না-হয় করব। কিছু না হয়, কোনো বড় মানুষের বাড়ী ঢুকে তাদের ছেলে মানুষ করার কাজও জুটবে !

সুলতাকে কাছে টেনে নিয়ে শীতলা চুম্বন করল। বলল—এ যেন কেবল তোর মুখের কথা না হয় !—দেবদত্ত, তুমি যে হঠাৎ উদাসীন হয়ে গেলে ?

দেবদত্ত বলল—ভাবছি মেয়েরা তাহলে সত্যিই একদিন স্বাধীন হবে।

শীতলা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

মাঠের ওপর অপরাহ্ন নেমে এসেছিল। এই মাত্র দূরে কোথায় ট্রেনের একটি বাঁশীর আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সুলতা চলল মাঠ পার হয়ে।

কিয়দ্দূর সে এগিয়ে যাবার পর দেবদত্ত বলল—আচ্ছা শীতলা, তোমাদের আশ্রমে অক্ষম মেয়ের সংখ্যা কত ?

—একটিও নেই !

—মা'র কাছে সময় নিয়েছি, নিষ্কর্মা মেয়েগুলোকে আমায় পুষতে হবে।

—নতুন বটে। জীবনে তোমার এই কাজটিই বাকী ছিল ! তোমার ভার কে নেবে শুনি।—একবার দেখো দেখি মুখ ফিরিয়ে ওদিকে ? দেখো দেখো—

সুলতা ততক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে। দুজনেই কপালে হাত দিয়ে সূর্যের আলো আড়াল ক'রে সেই দিকে তাকাল।

শীতলা বলল—হাঁটতে শিখেছে, নয় ?

—হুঁ, তোমার সংস্পর্শ মিথ্যে হয় নি।

শীতলা হেসে বলল—ছিঃ, মুখের ওপর এ রকম প্রশংসা নাই বা করলে ?

—প্রশংসাটা সুমুখে শোনাই ভাল, আড়ালের প্রশংসায় অনেক গলদ থাকে। যাই হোক, তুমি তাহলে চললে সুলতার সঙ্গে?

একটু হেসে শীতলা বলল—পাগল! মাকে ছেড়ে যাব কোথায়?

—তার মানে? তাঁহলে সুলতা—

শীতলা আবার হাসল। বলল, সুলতা নিজেকে চিনতে পেরেছে, তার আর ভয় নেই; কিন্তু মাকে ছাড়লে মা'র যে চলবে না আলোক! আমি তাঁকে নিখুঁত করবার ভার নিয়েছি, তাঁর যত গ্লানি যত গলদ আমি ছাড়া আর বইবে কে?

শেষের কথায় তার কণ্ঠে বাজল কারুণ্য।

দেবদত্ত বলল—সুলতা যখন এল আমাদের মধ্যে তখন ওকে একলা ছেড়ে দেওয়াও কঠিন। উত্তেজনার পরে যে অবসাদ তার চেহারা ভাল নয়! এই আবেগ যখন ওর চোখ থেকে মুছে যাবে তখন সে চোখ হবে অন্ধকার। সুলতাকে তুমি ছেড়ো না শীতলা।

শীতলা বলল—ছাড়ব না কিন্তু যাব কোথায় ওকে নিয়ে? গেরুয়ার নেশা ওর গেছে কেটে, পূজো-আর্চা করে কলের পুতুলের মতন, সন্ন্যাস আর ওকে তৃপ্তি দেয় না, গীতার শ্লোক পড়তে গিয়ে ঘুম আসে···আমার কাছে কি ও থাকতে পারবে?

দেবদত্ত একটুখানি হাসল। বলল—সত্যি কথা একটি বলব শীতলা? সুলতাকে তুমি এত ভালবাসো শুধু এই জন্যেই। এই সব ধর্মাচার, সন্ন্যাস, গেরুয়া, গীতা, তোমার এতটুকু ভাল লাগে না! আমি জানি আর-একদিন তুমি বলেছিলে—

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দুই হাত দিয়ে শীতলা তার মুখ চেপে ধরল—চুপ কর, তুমি আমাকে পাগল করো না আলোক, তুমি জানো এ ছাড়া আমার অন্য গতি নেই, তুমি জানো······

দেবদত্ত থামল না। নিজের মুখখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলতে লাগল—হ্যাঁ জানি, জানি সব মেয়েরই মত তুমি চেয়েছিলে একখানি ঘর, একটি নিশ্চিন্ত নিভৃত সংসার, একটি ভালবাসার মানুষ, একটি সন্তান! তুমি শুধু চেয়েছিলে—

দেবদত্তর বুকের মধ্যে রুদ্ধ আবেগে শীতলার চোখ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে এল। বলতে লাগল—চুপ কর আলোক, তুমি চুপ কর।

দেবদত্ত চুপ করল না, বলতে লাগল—তুমিও হলে সন্ন্যাসিনী, নিজেকে পুরুষ বলে তুমি আমার কাছে বক্তৃতা দিতে লাগলে, এর চেয়ে অবিচার আর কি হতে পারে! এই পাহাড় যেখানে দূরে মাঠে গিয়ে মিশেছে, তুমি চেয়েছিলে তারই কোনো অস্পষ্ট পথের ধারে বসে জীবনের গান গাইতে। তুমি মুক্তি চাওনি, চেয়েছিলে বাঁধন, তুমি সন্ন্যাস চাওনি, চেয়েছিলে জীবন-সংগ্রাম!—দেবদত্ত বলল—শীতলা, আত্মবঞ্চনায় ধর্ম নেই!

দুজনেই মাঠের ওপর বসল। দেবদত্তর কাঁধের ওপর শীতলা মাথা রাখল। হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে শীতলা বলল—নিজেকে এত ছেলেমানুষ আর কোনোদিন মনে হয়নি!

—কেন?

মুখ তুলে শীতলা দেখিয়ে দিল তার চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। একটুখানি হেসে সে আবার বলল—হৃদয়টা এখনও মরেনি দেখছি। তাকে মারবার জন্যে এত চেষ্টা করলাম, এত অত্যাচার করলাম—উপবাস করিয়ে করিয়ে তাকে অচেতন ক'রে রাখলাম কিন্তু আজও দেখছি সে—

উত্তেজিত হয়ে দেবদত্ত বলল—তুমি আত্মহত্যা করছ, এ তোমার পাপ!

শীতলা আবার হাসল। বলল—দুটোই দিয়েছি মায়ের পায়ে বিলিয়ে, পাপ আর পুণ্য। এমন কি ইহকাল-পরকালও।

—ওই মা? যে এমন নীচ, ইতর, হিংসুটে···

—গুরুনিন্দা শোনা আমার অভ্যেস! কিন্তু আলোক, সত্যবানের প্রাণ যমরাজ ফেরত দেয়নি, অত দয়ালু যমরাজ নয়, সাবিত্রী তার ভালবাসার মানুষকে বাঁচিয়েছিল নিজের ইচ্ছাশক্তিতে।

—তোমার মরা সন্ন্যাসিনী মাকে বাঁচাবে তাই দিয়ে?

—সেটা ত আমার প্রতিজ্ঞা নয়, তপস্যা!

ছজনে উঠল—দেবদত্ত বলল—আমার কথা কি ভাবলে ?

শীতলা বলল—ভেবেছি কোনো দিন ?

—তা জানি, কিন্তু আমার ত কোনো কাজ রইল না ? দিন কাটবে কি নিয়ে ?

শীতলা বলল—ঘুরে বেড়িও। মঠ-মন্দিরের অভাব নেই, নদীর জল আর গাছের ফল—সে আছেই !

—আমি বলি, চল তুমি আমার সঙ্গে !

—সে ত অনেকবার শুনেছি আলোক। যুগে যুগে কতবারই দেখা হল তোমার সঙ্গে। আমি ভেসেছিলাম স্রোতে, তুমি পথ হারিয়েছিলে ডাঙার ওপর ; মেয়েরা ভেসে যায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে, পুরুষরা পথ হাতড়ে বেড়ায় অন্ধের মতন। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় ছাড়াছাড়ি হবার জন্যেই ;—

দেবদত্ত বলল—তোমার পথ তাহলে বাঁধাই রইল—কেমন ? মাকে আর এ জীবনে তুমি ছাড়বে না ?

শীতলা বলল—এবারের মতন সেই ব্যবস্থাই ত করেছি ! একটা জীবন এমনি ক'রেই না-হয় কাটালাম !

দেবদত্ত বলল—তোমার গলার আওয়াজে বিদায়ের সুর শোনা যাচ্ছে শীতলা। কেন বল ত ?

শীতলা মুখ ফেরাল বোধ করি অশ্রু গোপন করতে। মুখ ফিরিয়েই বলল—এক জায়গায় অনেক দিন থাকার সৌভাগ্য ত আমার নেই। আবার যে বেরিয়ে পড়বার সময় হল !

—কোথায় ?

শীতলা হাসল। বলল—ঠিকানা কি থাকে কোনোদিন ?

ও, আবার বুঝি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ? কিন্তু অগ্নিমের দায়িত্ব ?

রমাদি আর মাইতি-গিন্নী—ওরাই ত চালায় আমরা না থাকলে !

দেবদত্ত বলল—আবার কি তীর্থের পথে যাবার ব্যবস্থা চলছে ?

—নইলে আর যাব কোথায় ? তীর্থই ত আমাদের লক্ষ্য !

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। দূরে চণ্ডীর পাহাড়ের ওপর দিয়ে এক

দেবদত্তর বুকের মধ্যে রুদ্ধ আবেগে শীতলার চোখ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে এল। বলতে লাগল—চুপ কর আলোক, তুমি চুপ কর।

দেবদত্ত চুপ করল না, বলতে লাগল—তুমিও হলে সন্ন্যাসিনী, নিজেকে পুরুষ বলে তুমি আমার কাছে বক্তৃতা দিতে লাগলে, এর চেয়ে অবিচার আর কি হ'তে পারে! এই পাহাড় যেখানে দূরে মাঠে গিয়ে মিশেছে, তুমি চেয়েছিলে তারই কোনো অস্পষ্ট পথের ধারে বসে জীবনের গান গাইতে। তুমি মুক্তি চাওনি, চেয়েছিলে বাঁধন, তুমি সন্ন্যাস চাওনি, চেয়েছিলে জীবন-সংগ্রাম!—দেবদত্ত বলল—শীতলা, আত্মবঞ্চনায় ধর্ম নেই!

দুজনেই মাঠের ওপর বসল। দেবদত্তর কাঁধের ওপর শীতলা মাথা রাখল। হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে শীতলা বলল—নিজেকে এত ছেলেমানুষ আর কোনোদিন মনে হয়নি!

—কেন?

মুখ তুলে শীতলা দেখিয়ে দিল তার চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। একটুখানি হেসে সে আবার বলল—হৃদয়টা এখনও মরেনি দেখছি। তাকে মারবার জন্যে এত চেষ্টা করলাম, এত অত্যাচার করলাম—উপবাস করিয়ে করিয়ে তাকে অচেতন ক'রে রাখলাম কিন্তু আজও দেখছি সে—

উত্তেজিত হয়ে দেবদত্ত বলল—তুমি আত্মহত্যা করছ, এ তোমার পাপ!

শীতলা আবার হাসল। বলল—দুটোই দিয়েছি মায়ের পায়ে বিলিয়ে, পাপ আর পুণ্য। এমন কি ইহকাল-পরকালও।

—ওই মা? যে এমন নীচ, ইতর, হিংসুটে···

—গুরুনিন্দা শোনা আমার অভ্যেস! কিন্তু আলোক, সত্যবানের প্রাণ যমরাজ ফেরত দেয়নি, অত দয়ালু যমরাজ নয়, সাবিত্রী তার ভালবাসার মানুষকে বাঁচিয়েছিল নিজের ইচ্ছাশক্তিতে।

—তোমার মরা সন্ন্যাসিনী মাকে বাঁচাবে তাই দিয়ে?

—সেটা ত আমার প্রতিজ্ঞা নয়, তপস্যা!

'দুজনে উঠল—দেবদত্ত বলল—আমার কথা কি ভাবলে ?

শীতলা বলল—ভেবেছি কোনো দিন ?

—তা জানি, কিন্তু আমার ত কোনো কাজ রইল না ? দিন কাটবে কি নিয়ে ?

শীতলা বলল—ঘুরে বেড়িও। মঠ-মন্দিরের অভাব নেই, নদীর জল আর গাছের ফল—সে আছেই।

—আমি বলি, চল তুমি আমার সঙ্গে।

—সে ত অনেকবার শুনেছি আলোক। যুগে যুগে কতবারই দেখা হল তোমার সঙ্গে। আমি ভেসেছিলাম স্রোতে, তুমি পথ হারিয়েছিলে ডাঙার ওপর ; মেয়েরা ভেসে যায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে, পুরুষরা পথ হাতড়ে বেড়ায় অন্ধের মতন। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় ছাড়াছাড়ি হবার জন্যেই ;—

দেবদত্ত বলল—তোমার পথ তাহলে বাঁধাই রইল—কেমন ? মাকে আর এ জীবনে তুমি ছাড়বে না ?

শীতলা বলল—এবারের মতন সেই ব্যবস্থাই ত করেছি ! একটা জীবন এমনি ক'রেই না-হয় কাটালাম !

দেবদত্ত বলল—তোমার গলার আওয়াজে বিদায়ের সুর শোনা যাচ্ছে শীতলা। কেন বল ত ?

শীতলা মুখ ফেরাল বোধ করি অশ্রু গোপন করতে। মুখ ফিরিয়েই বলল—এক জায়গায় অনেক দিন থাকার সৌভাগ্য ত আমার নেই। আবার যে বেরিয়ে পড়বার সময় হল !

—কোথায় ?

শীতলা হাসল। বলল—ঠিকানা কি থাকে কোনোদিন ?

ও, আবার বুঝি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ? কিন্তু আশ্রমের দায়িত্ব ?

রমাদি আর মাইতি-গিন্নী—ওরাই ত চালায় আমরা না থাকলে !

দেবদত্ত বলল—আবার কি তীর্থের পথে যাবার ব্যবস্থা চলছে ?

—নইলে আর যাব কোথায় ? তীর্থই ত আমাদের লক্ষ্য !

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। দূরে চণ্ডীর পাহাড়ের ওপর দিয়ে এক

সারি বক উড়ে যাচ্ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে একটি নিশ্বাস ফেলে দেবদত্ত বলল—দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি, যাওয়া যাক—বেশ ত, তীর্থ ক'রে ফিরে এসো, আবার হয়ত দেখা হতে পারে। এখনকার মতন তা হলে—

শীতলা তেমনি হাসিমুখেই বলল—তোমাকে কেউ ছাড়লে তোমারও তাকে ছাড়তে দেরি লাগে না, তা জানি!

দেবদত্ত বলল—তুমি কি চাও তৃতীয় শ্রেণীর প্রেমিকের মত তোমার আসন্ন বিরহে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে হা হুতাশ করব?

শীতলা তার হাতটি ধরে বলল—রাগ করলে আলোক? তোমার কাজ রয়েছে যে!

—কি কাজ? তুমি গেলে আর আমার কোনো কাজ থাকবে না।

শীতলা। আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে, তা মনে আছে ত? তোমার এই আশ্রমের হাওয়ায় আমার দম আটকায়! সামান্য পাপ বৃহৎ পুণ্যকে নষ্ট করতে পারে! অত বড় আশ্রমটাকে বিষাক্ত করেছে তোমার মায়ের একটি কদর্য মনোভাব!

—তা হোক, তবু এসো একবার।

সে রাত্রিটি শুক্লপক্ষের, বোধ করি একাদশী তিথি। নিস্তব্ধ নিঃসাড় নিশীথিনী! জ্যোৎস্নার আলোয় দূরের পাহাড়গুলি যেন অটল স্তব্ধতার ধ্যানে বসেছে।

একটি সূর্যমুখীর চারার পাশে দাঁড়িয়ে সুলতা কোন্‌দিকে যে তাকিয়ে ছিল এবং কি ভাবছিল তা শুধু সেই জানে! হয়ত ভাবছিল আবার কোন্ একটি বিচিত্র জীবনের আহ্বান তার কাছে এসে পৌঁছেছে! এমনি সময় শীতলা চুপি চুপি পিছন দিক থেকে এসে তার চিবুকটি নেড়ে দিয়ে ডাকল—প্রিয়তমা?

সুলতা মুখ ফেরাল। বলল—শীতলাদি, তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলাম। মা নিজের মহল ছেড়ে এদিকে আর আসবেন না, তোমাকে তিনি এক্ষুনি ডাকতে পাঠিয়েছেন।

—কারণ ?

—কারণ তিনি ত কাউকে বলেন না। তবে বোধ হচ্ছে তিনি যেন কোথাও যাবার চেষ্টায় আছেন। পোঁটলা-পুঁটলি—

—ও, তাই নাকি? একেবারে এত তাড়াতাড়ি? আমি ভেবেছিলাম—শীতলা চিন্তিত মুখে কিয়ৎক্ষণ সুদূর জ্যোৎস্নালোকের দিকে তাকাল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল—আচ্ছা সুলতা?

সুলতা তার কোলের কাছে সরে এসে দাঁড়াল। শীতলা বলল—একটি ছবি তুই মনে মনে ভাবতে পারিস? ধর কোনো নদীর ধারে একখানি পাতার ঘরে দুটি ছেলেমেয়ে থাকে···চারিদিকে গভীর জঙ্গল, মানুষের চিহ্নও কোথাও নেই···ছেলেমেয়ে দুটির একা দিন কাটে। ছেলেটি খাবার সংগ্রহ ক'রে আনে, মেয়েটি আনে জঙ্গল থেকে কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে। ছেলেটি গান গায়, মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে শোনে···নদীর চড়ায় ছুটোছুটি ক'রে তাদের সারাদিন কাটে, জঙ্গলের মধ্যে তারা লুকোচুরি খেলতে যায়। রাতে তাদের পাতার ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো ঢোকে, দুজনে পাশাপাশি শুয়ে একটি একটি ক'রে আকাশের তারা গোণে···নিশ্চিন্ত, নিভৃত দুটি সহজ জীবনের খেলা। সুলতা ভাবতে পারিস?

সুলতা রুদ্ধকণ্ঠে বলল—দিদি—

শীতলা বলল—ধর যদি তোর এমন দিন আসে যে-দিন তুই সমস্ত দুঃখের তপস্যার শেষে একটি ভালবাসার মানুষ পেয়েছিস—ওরে, ওরে তোকে কেমন ক'রে বোঝাব, একজনকে, একটিমাত্রকে ভালবাসা জীবনের কতখানি সুখ।

শীতলা ছুটে সেখান থেকে চলে গেল। চলে যাবার পরেই দেখা গেল দেবদত্ত এইদিকেই এগিয়ে আসছে। সুলতা একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল—আপনি যে ফিরলেন আবার দেবদত্তবাবু?

—কি করি বল! তোমার শীতলাদি আবার নিয়ে এল টেনে-হিঁচড়ে! টানা-হেঁচড়াই ত চলছে সারা জীবনটা!

বেড়ার মাঝখানে ফুলের বাগান। চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, যুঁই ফুলের গন্ধে চারিদিক ভুর ভুর করছে। ফুলদার একখানি মখমলের আসন এনে পেতে দিয়ে সুলতা বলল—বসুন।

আসনের ওপরে এসে বসে প'ড়ে দেবদত্ত বলল—বড় তেষ্টা পেয়েছে সুলতা। সারাদিনের রোদ গেছে আজ মাথার ওপর দিয়ে, ঘণ্টা চারেক আগে মনে করেছিলাম এক ঘটি জল খাব।

সুলতা তাড়াতাড়ি জল ও মিষ্টান্ন এনে দিল। বলল—আজ আর কোথাও আপনার গিয়ে কাজ নেই, বিছানা ক'রে দিই, খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন।

আসনের ওপর বসেই খুঁটিতে হেলান দিয়ে দেবদত্ত বলল—বেশ লাগছে, আজকের রাতটা যেন মনোহর মৃত্যুর মতন।

সুলতা হাত তিনেক দূরে অনুগত শিষ্যার মত আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছিল। দেবদত্ত বলল—বহুকাল ধরে ভুলে গিয়েছিলাম, আকাশে ওঠে চাঁদ, গাছে ফোটে ফুল। আচ্ছা সুলতা, আমার সঙ্গে শীতলাকে দেখে তোমার কি কিছু মনে হয় না?

সুলতা বলল—আপনি যে শীতলাদিকে ভালবাসেন!

—ভালবাসা! ভালবাসার নিয়ম কি এ আশ্রমে আছে নাকি? বিশেষ ক'রে নরনারীর—

সুলতা বলল—আমি এর মধ্যে কিছু অন্যায় দেখিনে দেবদত্তবাবু।

দেবদত্ত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল—সত্যি আমি ওকে ভালবাসি সুলতা, এর চেয়ে বড় সত্যি আমার জীবনে আর হয়ত নেই। আজ অবধি বহু নারীর সঙ্গে বহু সম্বন্ধ পাতিয়েছি কিন্তু শীতলার সঙ্গে আমার অন্য কথা! ও হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমার ভাবের বন্ধু! সংসারে আমাদের দুজনের জীবন যে সমান মিথ্যে হয়ে গেছে, শীতলা আমার সেইখানকার বন্ধু।

শীতলা ফিরে এল অনেক রাতে। ঝিমঝিমে চাঁদের আলোয় তার অস্পষ্ট দেহলতাটি এঁকেবেঁকে এসে দেবদত্তর পাশে দাঁড়াল। কথায় কথায় এই দুটি নরনারী এতক্ষণ এমনিই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে

তৃতীয় ব্যক্তির আগমন তারা টের পায়নি। শীতলা হেসে বলল—বেশ, 'মিলনে নিখিল-হারা', কেমন ?

দুজনেই মুখ তুলল। চাঁদের আলোয় শীতলাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুদিকেই হেসে হেসে তাকাতে লাগল।

দেবদত্ত বলল—সুলতার যাত্রার দিন কবে ঠিক হল শীতলা ?

জবাবটা সুলতাই দিল—হয় কাল, নয়ত পরশু—শীতলাদিকে এখান থেকে ছাড়াতেই যা দেরি লাগবে !

মনে মনে এবার দেবদত্ত একটু না হেসে থাকতে পারল না। বলল—তুমি কি মনে কর, শীতলা তোমার সঙ্গে—?

—তবে ? সুলতা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে শীতলার দিকে তাকাল। নির্বিকার একটি স্নিগ্ধ হাসিতে শীতলার মুখখানি তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে-হাসি কেবল এই কথাই বলে, জীবনের সকল বন্ধনকেই সে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

দেবদত্তও হাসল। বলল—তোমার যেখানে বাস, শীতলার বাসা সেখান থেকে অনেক দূরে। পথটাও এক নয়, যাতায়াতে কেবল দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

সুলতা উঠে এল। শীতলার হাত দুটি কোলের মধ্যে নিয়ে মুখের কাছে মুখ তুলে বলল—দেবদত্তবাবু যা বললেন তা সত্যি ?

শীতলা বলল—দেবদত্ত ত মিছে কথা বলেন না ভাই।

—আমি তবে যাব কার সঙ্গে ?

শীতলা চোখের জল গোপন ক'রে বলল—তাই ত ভাবছি,—বলে সে সরে এসে দেবদত্তর কাছে দাঁড়িয়ে বলল—ওঠো একবার আলোকনাথ, শেষ হবার আগে যেটুকু বাকি আছে—সেটুকু শুধু কর্তব্য নয়, সেটি আমার কাজ। এসো, উঠে এসো।

দেবদত্ত মুখ তুলে তাকাল। শীতলা বলল—ভয় হচ্ছে পাছে কোনো চমক লাগাই, কিংবা কোনো ভোজবাজীর ধোঁকা দিই—মানুষকে হঠাৎ স্তম্ভিত ক'রে দেয় এমন কোনো কাজকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

তবু বিস্ময়ের কিছু ছিল বইকি! সুলতা হতচকিত হয়ে গেল।

দেবদত্ত বলল—গলার আওয়াজ তোমার ধরে এল মনে হচ্ছে? শীতলা, যে ঘটনাটা তুমি তৈরী করছ সেটা এখন আমার কাছে আর দুর্বোধ্য নয়, আগেই আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

চোখের জল চোখেই ছিল, শীতলা একটুখানি হাসল। বলল—এ ছাড়া অন্য পথ আমার জানা নেই আলোক! যে ক'জন আমরা একসঙ্গে মিলেছিলাম, আমাদের সম্বন্ধে এর চেয়ে স্বাভাবিক পরিণতি আর কে ভাবতে পারত বল ত? অন্য যে-কোনো বিচার হ'ত আমাদের পক্ষে অবিচার!

দেবদত্ত উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুলতার হাতটি টেনে নিয়ে দেবদত্তর ডান হাতের সঙ্গে মিলিয়ে শীতলা বলল—ফুটো জাহাজের মাস্তুলের ওপর বসল ঝড়ের পাখী—এর প্রতিবাদ আর চলে না। বিধাতার রাজ্যে বিশৃঙ্খলার আর শেষ নেই কিন্তু তবু যেন কোথায় একটি ঐক্য আছে। ঐক্য একটি আছে বলেই তাঁর রাজত্বে রোজ রোজ প্রলয় হয় না, রোজ একটা ক'রে মহামারী দেখা দেয় না!

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুলতা ও দেবদত্ত তার দিকে তাকিয়ে ছিল!

শীতলা বলতে লাগল—দুটো জীবনের যত ভাঙাগড়া, যত গোলযোগ সমস্তই আজ দুটো হাতে এসে মিলল। এ তোমাদের মিলন নয়, প্রেম নয়—এ হচ্ছে প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মানুষের নয়, মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর, নইলে এত বড় নাটকের উদ্দেশ্য মিথ্যে হয়ে যাবে! দেবদত্ত, তোমারই কাছে এসে পৌঁছুবার জন্যে সুলতার এতখানি দুঃখের তপস্যার দরকার হয়েছিল।

সুলতা যেন কি বলতে গেল, শীতলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—এ যা করলাম ভাই, এ তোর দিদির কার্যতঃ আশীর্বাদ, ফাঁকা কথার উৎসাহ দিয়ে মেয়েদের স্বাধীন বলে ত ছেড়ে দিতে পারিনে।

—কিন্তু দিদি—

—বুঝেছি, তবু চাই আশ্রয়। মেয়ে-জাতকে তোর ভেতর দিয়ে যেমন বুঝতে পারলাম, এমন আর কিছুতে নয়। তাই ত বলছি

আশ্রয় চাই, একজনকে না ধরলে তোর চলবে না!—দেবদত্ত? কথা বলছ না যে? ঘাড় হেঁট ক'রে রইলে কেন?

দেবদত্ত সোজা হয়ে বলল—এর পরেও মাথা তুমি তুলতে বল? তুমি জানতে মেয়েদের ভবি বইতে পারিনে। এত জেনেও তুমি—

—তোমাকে ত ভার দিই নি আলোক, তুমি দেখাবে পথ, সুলতাকে দিলাম তোমার ভার। দায়িত্ব না নিলে সুলতা ত দাঁড়াতে পারবে না!

—কিন্তু নিজে যে পথ জানে না তাকে—

—এবার কি নালিশ জানাবার পালা?

দুজনেই পরস্পর মুখের দিকে তাকাল, এবং সুলতার দৃষ্টির সুমুখেই দুজনের মুখ বিমল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সুলতা তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে শীতলার পায়ের ধুলো নিয়ে ভিতরে চলে গেল। মনে হল, কথা বলার শক্তি আর তার ছিল না।

তার পথের দিকে একবার তাকিয়ে দেবদত্ত বলল—কোথায় গেল বলতে পার?

শীতলা বলল—পারি। এ জীবনের মত বোধ হয় আজ ও নিশ্চিন্ত হল। এবার গেল মনের আশা মিটিয়ে কাঁদতে। সমস্ত রাত আজ ও চোখের জল ফেলবে! আনন্দের অসহ্য যাতনায় ওর ত আজ ঘুম আসবে না।

নির্বাক দুজনে পাশাপাশি বসে রইল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ যেমনিই তাদের চোখে ভাসতে লাগল, তেমনি ক'রেই মন্থর বাতাসে দুলতে লাগল সূর্যমুখী ও রজনীগন্ধার চারাগুলি। তারাও যেন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলছে, এই ভাল হল!

দেবদত্ত মুখ ফিরিয়ে চিন্তিত মুখে শীতলার দিকে তাকাল, তারপর বলল—কি বল ত? কি যেন হয়ে গেল শীতলা?

শীতলা নিঃশব্দে হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে সে অন্যদিকে ঘাড় ফেরাল, দেখা গেল, সর্বাঙ্গে তার হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

দেবদত্ত ধীরে ধীরে ডান হাতটা বাড়িয়ে তার মাথাটি শক্ত ক'রে

টিপে ধরে এদিকে ফেরাল, পরে দুটি একাগ্র দৃষ্টি শীতলার মুখের ওপর স্থাপন ক'রে স্থির হয়ে রইল। বলল—হাসো, দেখি?

শীতলা হাসতে লাগল নীরবে।

—আবার হাসো?

আবার শীতলা হাসতে লাগল। নিজের গলার কাছে হাত বুলিয়ে ঢোক গিলে তার পাগলের হাসি আর থামে না।

দেবদত্ত বলল—এবার কিন্তু আটকে যাচ্ছে—নিশ্চয়ই সহজ ক'রে আর হাসতে পাচ্ছ না শীতলা! হাসো?

এবার উঁচু গলায় জোরে হাসতে গিয়ে শীতলার মুখের ভিতর থেকে যেন একটি শরাহত রক্তাপ্লুত পক্ষিশাবক আর্তনাদ ক'রে বেরিয়ে এল, এবং সে শুধু মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই অশ্রুজলে চুরমার হয়ে সে দেবদত্তর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়ল।

শেষরাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। ভোর হতে তখনো অনেক দেরি, চন্দ্রালোক সবেমাত্র পাণ্ডুর হতে সুরু হয়েছে। রাত্রির রহস্যময় প্রশ্ন চোখে নিয়ে আকাশের শিয়রে শুকতারাটি জ্বল জ্বল করছে।

সুলতার নিদ্রিত দুটি আঁখিপল্লব ধীরে ধীরে খুলে গেল। মাথার কাছে আলোটি বোধ করি একটু আগে নিবে গেছে এবং তারই ওপর দিয়ে জানলার চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখের ওপর। মুখ ফিরিয়ে সে তাকাল ঘরের মধ্যে, পরে নিদ্রাজড়িত চোখ দুটি টেনে টেনে বলল—আপনি! বসে রয়েছেন?

দেবদত্ত বলল—তুমি জাগবে তাই বসে আছি।

—শীতলাদি ছিল যে আপনার কাছে?

—হ্যাঁ, সে চলে গেছে!

—চলে? ও, আমায় ডাকল না একবার?

—তোমার চোখে জল সে আর দেখতে চাইল না!

সুলতা খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে থেকে বলল—চলে গেছে! অত রাত্রে…কেউ জানল না…

তার চোখ আবার ঘুমে জড়িয়ে এল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সে উঠে বসল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, রাত শেষ হয়ে গেছে, আর তারই দিকে ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেবদত্ত বসে রয়েছে।

সকল ব্যবস্থাই ছিল, ঘুরে প্রস্তুত হয়ে সে যখন এসে দাঁড়াল দেবদত্ত উঠে তার সঙ্গে বেরিয়ে এল। আশ্রমের সবাই তখন নিদ্রিত।

আশ্রমের সীমানা পার হয়ে তারা মাঠে নামল, তারপর চলল মাঠ পার হয়ে পাহাড়ের দিকে। কারো মুখেই কোনো কথা নেই, কথা বলার আর কোনো কারণও ছিল না। চলতে চলতে তারা পাহাড়ের ধারে এল। এই পাহাড় পার হয়ে নদীতীর ধরে বহুদূর চলে গেলে শালের জঙ্গলের কাছেই দেবদত্তর পাতার ঘর।

সুলতার একটি হাত ধরে দেবদত্ত নাথের পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। পথটা খুব সুগম নয়, কাপড়-চোপড়ে সুলতার লাগল কাঁটাখোঁচা, গায়ে লাগল ছড় ও কাদা মাটির দাগ,—পথশ্রমে তার কপালের ওপর ঘামের বিন্দু জমে উঠল।

সূর্যোদয়ের ঐশ্বর্যে সমস্ত আকাশটা হয়ে উঠল রাঙায় রাঙা। ঘাসের ওপর শিশিরের ফোঁটায় লাগছে সেই আলোর আভাস। পাহাড়ের চূড়ার ওপর উঠে দেবদত্ত একবার নিঃশব্দে দাঁড়াল, তারপর দূর পূর্বদিকে মুখ ক'রে পা মুড়ে ব'সে প্রভাত সূর্যকে প্রণাম করবার জন্য মাথা হেঁট করল। সুলতাকে কিছুই বলতে হল না, পাশে এসে বসল, তারপর প্রণাম লুটিয়ে দিল একেবারে সাষ্টাঙ্গে। হেমন্তের প্রাতঃকাল তখন কুয়াসাচ্ছন্ন।

মনে হল তাদের সে প্রণাম কোনো দেবতার প্রতি, কোনো ধর্মের প্রতি, কোনো স্বর্গের প্রতি নয়,—সে প্রণাম উড়ে উড়ে চলল শুধু অসীম অনন্ত শূন্যলোকের দিকে উধাও হয়ে!

দেবদত্ত উঠে সুলতার হাতখানি আবার ধরে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল।

শীতের শেষ দিকটায় সুদূর দক্ষিণ দেশে কোনো এক দুর্গম তীর্থের পথে শীর্ণ দুটি নারীকে দেখা গেল। উপলখণ্ডময় কোনো একটি অখ্যাত শীর্ণ নদীর পথে তাঁরা চলেছিল। নদীটির চর জেগে উঠেছে, এপার ওপার বালি ধু ধু করছে। এই নদী তাদের পার হতে হবে!

শীতলা আগে আগে আর মা পিছনে পিছনে—

শীতলা মুখ ফিরিয়ে তাকাল; মায়ের দিকে নয়—ওপারে! অনেকটা পথ এসেছে বটে কিন্তু আরো যে অনেকখানি!

মা ডাকলেন—শীতলা?

—কেন মা!

—জল কি আর নেই?

—আছে বইকি, আপনার জন্যে জল আমার সঙ্গেই থাকে।—ব'লে শীতলা থমকে দাঁড়িয়ে হাতের কমণ্ডলু বাড়িয়ে মায়ের অঞ্জলিতে জল ঢেলে দিল, মা তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

—এ নদী পার হতে হবে শীতলা?

—নইলে ত সমুদ্র যাত্রার পথ খুঁজে পাব না মা।

মা বললেন—তোমার কি তেষ্টা লাগছে না?

শীতলা করুণ হাসি হাসল! হেসে বলল—ওটা ভুলেই গেছি।

ছায়া ও আশ্রয়লেশহীন শুকনো চড়ার দিকে তাকিয়ে মা বললেন—এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে যাবে?

—তীর্থে পৌঁছিবার আগে ত বিশ্রাম নেই মা

—ও, আচ্ছা চল তবে।

নদী পার হয়ে চলে যাবার সময় দুটি শ্রান্ত পথবাসিনী নারীর মাথার উপর ধীরে ধীরে গোধূলি-ম্লান সন্ধ্যা নেমে এল।